কাঞ্চন-তৃষ্ণা

কাঞ্চন-তৃষ্ণা

বিদগ্ধ শর্মা

চিনকো
১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ ॥ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক

মুণি বসু

চিনকো

১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলকাতা ১৯

প্রচ্ছদশিল্পী

সি. বাসু

মুদ্রক

শ্রীরণজিৎ কুমার ভৌমিক

সেনট্রাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলকাতা ১২

শত দুঃখ এবং লাঞ্ছনা সহ্য করেও যাঁরা নিজেদের আত্মবিক্রয় করেন নি, সেই সমস্ত নির্ভীক বুদ্ধিজীবি যোদ্ধাদের নামে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম।

এই বই-এর চরিত্রগুলি কাউকে উপলক্ষ করে সৃষ্ট হয় নি।
কোথাও কোনো সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত

লেখকের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বই
॥ ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট ॥

কা | ঞ্চ | ন | তৃ | ষ্ণা

কলকাতার ইংরেজি দৈনিক কাগজের স্টাফ-রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষের কলম আবার অগ্নিবর্ষণ করল।

রাত্রিবেলা চারজন লোক একটা ফুটপাথের উপর শুয়ে ছিল। গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রামগ্ন তখন একখানা মাল বোঝাই লরী এসে তাদের চারজনকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলল।

খবরটা চমকপ্রদ, একটা ভালো scoop সন্দেহ নেই। কিন্তু সুনীলেশের লেখাটার মধ্যে ঘটনার ট্র্যাজেডি ছাড়াও সমাজ এবং দেশের হালফিল দূরবস্থার কথা ছিল— ছিল কলকাতা শহরের কথা, যেখানে জীবন এবং মৃত্যু হাতধরাধরি করে চলে— যেখানে সব-কিছুর মূল্য বেড়েছে, শুধু মানুষের জীবন ছাড়া। একটা শ্লেষ এবং বিদ্রূপ তাঁর লেখাটাকে অগ্নিবর্ষী করে তুলেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আপিসে যেতেই কাগজের মালিকের ঘরে সুনীলেশের ডাক পড়ল। সুনীলেশ এই আহ্বানের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। এ রকম বহুবার মালিক শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী স্টাফ-রিপোর্টারদের ডেকে থাকেন, বিশেষ করে তাকে। তবে আজ যেন আহ্বানটা খুব জরুরি। তিনি তো রাত্রি আটটার আগে কখনও আপিসেই আসেন না।

সহকর্মী বিনয় সেন বললেন— যাও-না হে বাপু! কর্তা ডেকেছেন যখন, কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। একটা special assignmentও হতে পারে।

সুনীলেশ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই শচীন্দ্রনাথ ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

—এসো, সুনীলেশ বসো।

—স্যার, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ, ডাকতে কি মানা আছে ?

—কি যে বলেন স্যার—আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোনও জরুরি কাজ পড়েছে।

শচীন্দ্রনাথ বললেন— না, তেমন জরুরি কিছু নয়। ভেবেছি কি জানো সুনীলেশ, এখন থেকে মাঝে মাঝে তোমাদের ডেকে আলাপ-আলোচনা করব। তোমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। শত হলেও তোমাদের দিয়েই তো আমার কাগজ চালাতে হয়। —হ্যাঁ, ভালো কথা সুনীলেশ, আজকের কাগজে তোমার লেখাটার কথা বলছিলাম।

—বলুন স্যার।—সুনীলেশ বলল।

—তোমার লেখাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে, দেশের যা অবস্থা। বলে শচীন্দ্রনাথ সুইং চেয়ারে দুলতে লাগলেন।

সুনীলেশ চোখের সামনে মালিকের ছ'তলা নতুন বাড়ির নকশা দেখতে পাচ্ছিল। তিনি দুলছেন— তার সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিকতার ইতিহাস দোদুল দোলায় দুলছে— আর দুলছে লক্ষ লক্ষ মানুষের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ।

চোখদুটো বন্ধ করে তিনি আবার বললেন— কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো, লেখাটা একটু কড়া হয়ে গেছে। দু-এক জায়গা থেকে টেলিফোন এসেছিল, লেখাটা বড্ড উত্তেজক হয়েছে। —বিশেষ করে কাগজটা যখন বিদেশে যায়, তখন কলকাতায় মানুষের ফুটপাথে শোবার ব্যাপারটা অমনভাবে ফলাও না করাই ভালো ছিল।— অবশ্যি আমি সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলছি না। একজন সৎ এবং কর্তব্যপরায়ন সাংবাদিক হিসাবে সত্যিঘটনাটার ওপর আলোকপাত করা ঠিকই হয়েছে— কিন্তু দেশের সম্মান, সরকারের সম্মান যেখানে জড়িত সেখানে একটু মোলায়েম করে লেখাটাই কি ভালো ছিল না ?

সুনীলেশ বলল— হয়তো তাই। তবে স্যার, জিনিসটার গুরুত্বটাও

একটু ভেবে দেখা দরকার।— অবশ্য ভবিষ্যতে আপনার উপদেশ নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

না না, সুনীলেশ— তুমি ভেবো না, তোমার কলমের উপর আমি embargo বসাতে চাই। শুধু বলি, তোমার ক্ষুরধার লেখার মধ্যে আরও একটু যদি স্বদেশপ্রীতির ছোঁয়াচ থাকে, তবে মন্দ হয় কি? তুমি লিখবে বই-কি, প্রাণ খুলে লিখবে। তোমার লেখার খুব প্রশংসা। তোমার সাপ্তাহিক 'রাউণ্ড আপের' জন্যে আমার কাগজের বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে, এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

সুনীলেশ বলল— তার চেয়ে বরং এ ধরণের লেখা লিখবার আগে আপনাকে একবার দেখিয়ে নেব!

কোনও প্রয়োজন নেই সুনীলেশ, মালিক বললেন— তোমাকে শুধু দু-একটা suggestion দিলাম। মানে সামান্য একটু দেশপ্রেম—।

দেশপ্রেমের কথা শুনে সুনীলেশের মনে কৌতুকমিশ্রিত উষ্মার সঞ্চার হল। শচীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক বই-কি? কোটি টাকার মালিকের দেশপ্রেম একটু অন্যধরণের। তার মধ্যে আভিজাত্য আছে, শালীনতা আছে, কৃষ্টি আছে—সে দেশপ্রেম ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাস্তা পরিক্রমা নয়; 'কলার' খসে যাওয়া জামা পরে ময়দানে বক্তৃতা করা নয়। সে দেশপ্রেম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে বসে স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপনে প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় রোটারিয়া স্যার বীরেন মল্লিকের নিউ আলিপুরের বাড়িতে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস পালন করায়। সে দেশপ্রেমে কোনও উত্তেজনা নেই, জ্বালা নেই, অনিশ্চয়তা নেই। বাইরের দৈনন্দিন অপ্রিয় ঘটনা তাকে ছুঁতে পারে না।

মাত্র মিনিট খানেকের জন্য সুনীলেশ কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে মালিকের দেশপ্রেমের রাজত্বে ঘুরে এসে বলল— চেষ্টা করব স্যার, আপনার আদেশ মনে থাকবে।

মালিক বললেন— আমি সম্পাদককে বলে দিয়েছি। তিনি তোমাকে একটু সমঝে দিতে চেয়েছিলেন।

—আমাকে সমঝে দেবার প্রয়োজন হবে না স্যার— সুনীলেশ বলল। চাকরি করি, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তৃপক্ষ যা চাইবেন আমাকে তাই করতে হবে, এ কথা আমার জানা আছে।...তবে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা লিখতে গেলে মনের ইচ্ছা গোপন করা শক্ত হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুনীলেশ ভাবছিল, মালিক আরও একটু দেশপ্রেম চান— দেশপ্রেম মানে যারা উপরে বসে আছেন তাদের কাছে শতলক্ষ অবহেলিত পদদলিত মানুষের স্বার্থকে বলিদান করা। কিন্তু লেখনীকে স্তব্ধ করা বড়ো বেদনাদায়ক।

ভোরবেলা সুনীলেশ দেখল ভৃত্য বিদ্যাধর জ্বরে তখনও অচৈতন্য। মাথায় হাত রেখে নাড়ীটা একটু ধরে দেখল। তার পর নিজের ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার নিয়ে জ্বরটা দেখে নিল। অনেক জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে হয়তো। ডাক্তার ডাকতে হবে। অথচ সারারাত্রি জাগরণের ফলে চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু সে ছাড়া বিদ্যাধরের আছে কে? বিদ্যাধরও এই একই কথা ভাবে— সে ছাড়া দাদাবাবুরই বা কে আছে?

সুনীলেশ বাবাকে হারায় পনেরো বছর বয়েসে, তার পর পঁচিশ বছর বয়েসে মাকে হারায়। ভাইবোন কেউ নেই, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শুধু আছেন বাবার এক বিধবা বোন। তিনি নিঃসন্তান। কিন্তু তার আবার এক বিরাট সংসার রয়েছে— ননদের সংসার। ছেলেপুলে নিয়ে জনা সাত-আট পোষ্য। সুনীলেশ যা মাইনে পায়, তার অর্ধেকের বেশি পিসীকেই দিতে হয়—না হলে তার সংসার চলে না।

কলকাতার উপকণ্ঠে পিসী থাকেন। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে হয়। সুনীলেশকে পিসীর বড়ো প্রয়োজন।

সারারাত ডিউটি দিয়ে এসে এক কাপ চা জুটল না। বিদ্যাধরের অসুখ। আরও একটু বেলা হলে সামনের রেস্টুরেন্টটা দরজা খুলবে। মালিক আসেন বেলা ন'টায়। একজন কর্মচারী সকাল ছ'টা নাগাদ এসে দোকান খোলে। উনুন ধরাতে পুরো একটি ঘণ্টা। গুটিদশেক দেশলাইয়ের কাঠি খতম না হলে কোনোদিন উনুন ধরবে না। একটা দেশলাইয়ের কাঠি বাক্স থেকে বের করে ধরাতে পাঁচ মিনিট। কর্মচারীটির মিনিটে মিনিটে হাইতোলা আর আড়মোড়া ভাঙা। সুনীলেশ দাঁড়িয়ে সেদিনও দেখছিল সেই উনুন ধরানো পর্ব। কিন্তু বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কেবলই ভাবছিল অসুস্থ বিদ্যাধরের কথা, নিজে অসুস্থ হলে কিছু ভাববার থাকে না। আধ ঘণ্টা পর পর গরম চা, সেঁকা পাউরুটি আর আলু ভাজা, তার পর লুচি আর তরকারি। শরীর আরও খারাপ হলে বার্লির জল, আর সঙ্গে দু-একখানা পটোল ভাজা, যখন যা প্রয়োজন। বিদ্যাধর থাকতে কোনও ত্রুটি হবার জো'টি নেই।

হঠাৎ বিদ্যাধরের কাছে এগিয়ে আসতেই সুনীলেশ দেখল মাধবী দাঁড়িয়ে আছে। পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে মাধবী। পিতৃ-মাতৃহীনা। মামার কাছে থাকে। লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়েছে অনেক কাল। এখন মামীমার ফুটফরমাস খাটে। বিদ্যাধর একদিন বলেছিল— মাধবীদি আছে বলে মামীমা ঝি তুলে দিয়েছেন। বড়ো ভালো মেয়ে। মুখে কথাটি নেই।

মাধবীর এক হাতে এক বাটি বার্লি, আর-এক হাতে এক কাপ চা। সুনীলেশকে দেখে মাধবী সপ্রতিভ ভাবে বলল— আপনার জন্যে এক কাপ চা এনেছি— যদি কিছু মনে না করেন...। সুনীলেশ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। সেই মুহূর্তটায় মাধবী সুনীলেশের

পরম আত্মীয়া। বিদ্যাধরের কাছেও তাই। সারারাত্রি জ্বরে ধুঁকে এক বাটি বার্লির মূল্য অনেক।

সুনীলেশকে চায়ের কাপটা দিয়ে মাধবী চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার এল। এবার এসেছে বার্লির বাটি এবং চায়ের কাপটা নিয়ে যেতে। সুনীলেশের মনে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বিদ্যাধরের কাছে মাধবী সম্বন্ধে খানিকটা শুনেছে। দু-একদিন বিদ্যাধরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। ওর সঙ্গে আজই প্রথম আলাপ।

এবার আসতেই সুনীলেশ উঠে গিয়ে বলল— আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনি ব্যবস্থা না করলে বিদ্যাধরের খাওয়া হত না। আমি যে কি করতাম জানি না। আর তা ছাড়া নাইট ডিউটি দিয়ে এসে আমারও এক কাপ গরম চায়ের বড়ো প্রয়োজন ছিল। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

মাধবী লেখাপড়া জানে না। ধন্যবাদের উত্তরটাও দিতে শেখে নি। অজস্র কথা মনের কোণে জড় হলেও ভাষার অভাবে কথা বলতে পারে না। তাই কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মুচকি হেসে কাপ আর বাটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তার পর আরও দুবার মাধবী এল অসুস্থ বিদ্যাধরের তদারকি করতে। ওর মাথা ধুইয়ে দিল, দুপুর বেলার পথ্যের ব্যবস্থা করল। রোগীর পরিচর্যা করা বড়ো কম কথা নয়। দেখে মনে হচ্ছিল এ বাড়ির সঙ্গে মাধবীর ঘনিষ্ঠতা যেন অনেক কালের।

বেলা বারোটা নাগাদ সুনীলেশ যখন আপিসে যাবে, তখন হঠাৎ মাধবী আবার এল। দাঁড়িয়ে থাকবার রকম দেখে সুনীলেশ বুঝতে পারছিল, কিছু বলতে চাইছে— তাই নিজেই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল— কিছু বলবেন?

মাধবী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গড়গড় করে বলে গেল— মামীমা বলেছেন, যদি কিছু মনে না করেন, এ বেলাটা আমাদের ওখানেই খেয়ে নিন। বিদ্যাধরদা অসুস্থ, আপনার রান্না হয় নি।

এবার সুনীলেশকে প্রতিবাদ করতে হল। একবার সকালে চা হয়েছে— বিদ্যাধরের পরিচর্যা হয়েছে। ও বলল—না না, কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেব। আপনার মামীমাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। যেমন করে এসেছিল, মাধবী ঠিক তেমনি চলে গেল।

সুনীলেশ ভাবল, মাধবী খুব লক্ষ্মী মেয়ে। সেই চিরকালকার বাঙালী মেয়ে। ভালোবাসা, দয়া, মায়া এবং মাতৃত্বের প্রতীক। অন্যের দুঃখ দেখলে অভিভূত হয়ে পড়ে।

আপিসে যেতেই মালিকের বেয়ারা এসে সুনীলেশকে জানালো, সাহেব সেলাম দিয়েছেন। সুনীলেশ প্রমাদ গুনলো। আবার অসময়ে সেই আহ্বান ?

আজ কিন্তু আবহাওয়া একেবারে আলাদা। আজ শচীন্দ্রনাথ ধীর এবং নম্র। চেম্বারের বাইরে থাকতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন— এসো, এসো। তার পর ঘরে ঢুকতেই বললেন— খবর কি বলো— আজকে তো তোমার লেখা কিছু দেখলাম না। কালকে আমার কথায় রাগ করো নি তো ?

—মোটেই না স্যার— শক্ত হলেও আপনার একটা পলিসি আছে। আপনি মালিক।

শচীন্দ্রনাথ বললেন—ও রকম ভাবে কথা বোলো না সুনীলেশ। আমার পলিসি শুধু একটা। দুটো পয়সা রোজগার করা। আর কিছু নয়। তবে বুঝতে পার তো, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

—ঠিকই বলেছেন স্যার।

—আচ্ছা সুনীলেশ, তুমি প্রফেসরি ছেড়ে এ লাইনে ঢুকলে কেন ?—মালিক বললেন।

—যখন ঢুকেছিলাম তখন ভেবেছিলাম এ লাইনে রোজগার ভালো হবে। এখন দেখছি আটটি বছর সে লাইনে থাকলে এ চাকরির চেয়ে বেশি মাইনে পেতাম। সঙ্গে দু-চারটে টিউশনি থাকলে তো কথাই ছিল না।

—সত্যিই তোমার উপর কিছু অবিচার আমি করেছি। তোমাকে একটা special gradeএ রাখা উচিত ছিল।

—আমি special grade চাই নে স্যার। সুনীলেশ বলল—যেদিন সকলের grade বাড়বে, সেদিন আমারও বাড়বে। আমি আপনার কাছে সকলের চাইতে আলাদা করে কিছু চাই না।

—কিছু মনে কোরো না, সুনীলেশ— তুমি বড্ড একরোখা। নিজের ভালো নিজে বুঝতে পার না।

—ঠিক তা নয় স্যার— আমি জীবনে কতকগুলি নীতি মেনে চলি। বৃহৎ ইংরেজি কাগজের মালিক শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বুঝতে পারলেন এ সিংহ শাবক— এর সংগে তর্ক করা বৃথা। তিনি কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন—হ্যাঁ, যে কথা বলবার জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। যদি রাজী হও তো বলি—সুনীলেশ বলল— যদি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ না হয়, তা হলে আমি নিশ্চয়ই করে দেব স্যার, বলুন।

—আমাকে কয়েকটা বাংলা কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করে দিতে হবে। গোটাকয়েক রবীন্দ্রনাথের, কয়েকটা নজরুল ইসলামের, আর কয়েকটা আধুনিক কবিদের লেখা— করে দেবে তো?

—চেষ্টা করে দেখব, এই মাত্র বলতে পারি স্যার।

—সেইজন্যেই তো তোমাকে বলা।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আহা-হা জিজ্ঞেস করাবার আছে কি এতে? আমার উদ্দেশ্য জানতে চাও এই তো? এইটুকু জেনে রাখো— এগুলো বিদেশে যাবে, তোমার নাম হবে। চাই কি বেশ-কিছু পেয়েও যেতে পারো।

সুনীলেশ বলল— আপাততঃ কিছু পাবার লোভ আমার নেই। এখন কাজটা ভালো করে করতে পারলেই তবে রক্ষে। শচীন্দ্রনাথ বললেন, এই তো ভালো কথা! কিন্তু জিনিসটা আমার খুব তাড়াতাড়ি চাই।

আপিসে এসে বসতেই সহকর্মী বিনয় সেন একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল— কপাল ফিরল নাকি? তাই তো বলি, শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী স্টাফ-রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষকে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার ডেকে পাঠালেন! তা ব্যাপারখানা কী বলো তো সুনীলেশ? মাইনে বাড়ল নাকি?

সুনীলেশ বলল—আর একটুখানি বাকি। আজই হয়তো বাড়তো, তবে অল্পের জন্য ফস্‌কে গেল।

বিনয় সেন বললেন—Special grade-এর offer পেয়েছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—তার পরেই কয়েকটা বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমা করবার অনুরোধ এসেছে বোধ হয়?

—তার মানে?—সুনীলেশ চেয়ার ছেড়ে ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে। তোমার কাছেও এ offer এসেছিল নাকি?

—না, আমার কাছে আসবে কেন? আমি তো আর সুনীলেশ ঘোষের মতো ভালো ইংরেজি জানি না।

—ব্যাপারটা খুলে বলোই না— সুনীলেশের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ।

—আরও একজনের কাছে এ offer এসেছিল।

—কে সে— কার কথা তুমি বলছ?

—অধ্যাপক মুরারি ঘোষ।

—তার পর?

—অধ্যাপক special grade পেয়েছিলেন, কিন্তু···

—থামলে কেন? —সুনীলেশ চেঁচিয়ে উঠল।

—মাত্র তিন মাস আর তিনি এখানে চাকরি করেছিলেন।

—হেঁয়ালি ছাড়ো, সুনীলেশ বলল।

—কোনও এক বিদেশী কাগজে যখন কবিতাগুলো ছাপার অক্ষরে বেরুলো, তখন দেখা গেল, মুরারি ঘোষের নামের বদলে শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর নাম রয়েছে। প্রফেসর বড্ড বেশি shock পেলেন। একটা মফস্বলের কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। সুনীলেশ বলল— ভারি অদ্ভুত তো? একি বলছ বিনয়? উনি তো আমায় বললেন আমার নাম হবে, চাই কি কিছু পারিশ্রমিকও পেতে পারি।

—ও কথা বলা ছাড়া তাঁর উপায় কি? তবে এতে অসুবিধেরই বা কি আছে, আমি বুঝি না। টাকার বিনিময়ে নাম বিক্রয়, এ তো আমাদের দেশে হামেশাই হচ্ছে। আমি তো বুঝতে পারি না, প্রফেসর মুরারি ঘোষই বা চাকরি ছাড়লেন কেন আর স্টাফ-রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষেরই বা হকচকিয়ে যাবার কারণ কি? তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখছি, যদি চাকরির মায়া থাকে তো কাজটা করে দিও।

সুনীলেশ আর কথা বলল না। টেবিলের উপর মাথা গুঁজে ভাবতে লাগল— ক্রোড়পতি শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর এ কি দুর্বলতা? মানুষের মানসিক দৈন্য কোন্ পর্যায়ে নামতে পারে? এ কাঙালপনা কেন?

দিনসাতেক পরে সুনীলেশ তর্জমা করা কবিতাগুলো নিয়ে যখন শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করল, তখন ভদ্রলোকের আনন্দ আর ধরে না। আনন্দে তিনি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। হয়তো বা শচীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, সুনীলেশ তর্জমাটা শেষ পর্যন্ত না-ও করতে পারে। কিছুই বলা যায় না। মর্জি না হলে সুনীলেশকে দিয়ে কোনও কাজই করানো যায় না।

তখন রাত্রি আটটা হবে। শচীন্দ্রনাথ তাঁর কামরায় একটা বিরাট ডেক-চেয়ারে বিরাটতর দেহটাকে এলিয়ে পড়ে ছিলেন। এমন সময় সুনীলেশ ঢুকলো।

—শচীন্দ্রনাথ বল্লেন আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানি, তুমি ইংরেজিটাই যে শুধু ইংরেজদের মতো লিখতে পারো তা নয়, তোমার সময় এবং কর্তব্যজ্ঞানও ইংরেজদের মতো।

সুনীলেশ বলল— আমার আপত্তি করবার আছে। আমি ভারতীয় কিংবা বাঙালীর মতো নই, এ কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

শচীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন— জাতির গৌরবে তুমি নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত হবে সন্দেহ নেই।—কিন্তু জাতিতে জাতিতে অনেক তফাত। মানুষে মানুষেও তো তফাত রয়েছে যথেষ্ট। জান সুনীলেশ, সেবার বিলেতে এক ভারি মজা হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের Speakerএর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মিনিটপাঁচেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।···সুনীলেশ প্রমাদ গুনলো। একবার শুরু হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে থেকে লণ্ডন Zoo এবং সেখান থেকে ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি কিছুই বাদ যাবে না। হঠাৎ সুনীলেশ বলে উঠল্— স্যার, আমায় আবার এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে।—তর্জমাগুলো নিন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই— তুমি তর্জমাগুলো আমাকে একটু পড়ে শোনাও তো! বলেই শচীন্দ্রনাথ আরাম কেদারায় আরও একটু আরাম করে বসলেন।

সুনীলেশ একটি একটি করে তর্জমা করা কবিতা পড়তে লাগল। শচীন্দ্রনাথের তখন ভাবাবেগে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। পা দুটো মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে— ডান হাতটা বাঁ হাতের আঙুলগুলোর উপর অকারণে ওঠা-নামা করছে। তাঁর ওষ্ঠাধরে অদ্ভুত এক হাসির রেখা। যেন অন্য কোনও এক জগতে প্রবেশ করে তিনি পরম রমণীয় কোনও দৃশ্য অবলোকন করছেন।

সুনীলেশ নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণে কবিতা পড়ছিল। যেই

একটা কবিতা পড়া শেষ হওয়া, আর তখনি শচীন্দ্রনাথ মৃদু কণ্ঠে সুনীলেশকে বললেন— original বাংলাটা একটু পড়ে শোনাও দেখি।

সুনীলেশ পড়ল।

—ও! কি অদ্ভুত—কি অদ্ভুত! আরও একটা পড়ো। শচীন্দ্রনাথ অনুরোধ জানালেন।

শচীন্দ্রনাথ চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিলেন— বিদেশের কোনও এক বড়ো শহরের কবি-সম্মেলনে তিনি কবিতাগুলো পড়ছেন, আর চার দিকে গুণমুগ্ধ ভক্তরা মৃদু করতালি দিচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের চাইতেও উদাত্ত কণ্ঠে একটা কবিতা পড়তে পারার সম্মান অনেক বেশি। সম্মানের চাইতে বড়ো জিনিস সংসারে আর কি-ই বা আছে।

সুনীলেশের পড়া থেমে গেছে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ তখনও আধতন্দ্রাবিজড়িত চোখে বসে আছেন। সেই মৃদু হাস্যউদ্ভাসিত মুখ— অনুভূতিময় জীবনসত্ত্বার একটা অদ্ভুত প্রকাশ।

—স্যার, আমার পড়া শেষ হয়েছে। সুনীলেশ বলল।

শচীন্দ্রনাথের স্বপ্ন তখনও ভাঙে নি। তিনি বাঁ হাত দিয়ে সুনীলেশকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করলেন।

মিনিট-দুই কি তিন। হঠাৎ তাঁর পা দুটো ভয়ানক বেগে নড়তে লাগল। সমস্ত শরীরে যেন একটা প্রকম্পিত উত্তেজনার আভাস। বলে উঠলেন— সুনীলেশ, তুমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না।

—কোনও প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করবে না?

—এখনও প্রমাণ যখন পাই নি…

—তুমি হয়তো জানো, আমাদের পরিবারে বহু প্রেতবিশারদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার ঠাকুর্দা মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনও

মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। ভাবছ, আজগুবি, তাই নয় ?

—আজগুবি কি না জানি না— তবে অনেক সময়ে মানসিক অসুস্থতার জন্যে মানুষ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাকে সত্য বলে মনে করে।

শচীন্দ্রনাথ গম্ভীর হলেন।—তুমি আমার লেখা বইখানা পড়েছ নিশ্চয়ই।

—আজ্ঞে না।

—পড় নি ? বইখানাতে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্ততঃ এক হাজার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। পৃথিবীর বহু দার্শনিক তথ্যগুলোকে নির্ভুল বলে ঘোষণা করেছেন।

—আসল কথা কি স্যার, সুনীলেশ বলল— আমার দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ কোনও interest নেই।

—সে কথা অবশ্য আলাদা— শচীন্দ্রনাথ বললেন।

আবার মিনিটপাঁচেকের নিস্তব্ধতা। সুনীলেশ এখন পালাতে পারলে বাঁচে— কিন্তু শচীন্দ্রনাথ অনুমতি না দিলে যায়ই বা কি করে ?

হঠাৎ শচীন্দ্রনাথ বললেন—সুনীলেশ, একটা ভূতের গল্প বলো।

—সত্যি বলছি স্যার আমি ভূতের গল্প জানি না। আমি কখনও ভূত দেখি নি।

—নিজে না দেখলেও, গল্প তো শুনেছ ?

—হয়তো দু-একটা ঘটনার কথা শুনেছি, কিন্তু তা বিশ্বাস করি নি— আর বিশ্বাস করি নি বলে ভালো করে শুনিও নি। শচীন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন— ভালো করে না শুনে থাকতে পার কিন্তু কিছু শুনেছ তো ? যতটুকু শুনেছ তাই বলো।

—স্যার, আমাকে আপনি অত্যন্ত অসুবিধেয় ফেললেন। আমি যা বিশ্বাস করি না, তা নিয়ে কিছু বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

শচীন্দ্রনাথ এবার আকস্মিকভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন—Please,

সুনীলেশ, please। সুনীলেশ তাকিয়ে দেখল, শচীন্দ্রনাথের চোখে মুখে হতাশার ছায়া।

ও বুঝতে পারল বানিয়ে হলেও ভূতের গল্প তাকে বলতেই হবে। কোনও উপায় নেই। তার পর শুরু করল—

—সে অনেক দিনের কথা। আমাদের বাড়িতে একজন চাকর ছিল। তার নাম বনমালী। সে রোজ রাত্রিতে দেখতে পেত একটি ঘোমটাপরা বউ আমাদের বাড়ির সামনের গেট দিয়ে ঢুকে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত।···

শচীন্দ্রনাথ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনও তার মুখে সেই মৃদু হাসি। সুনীলেশের মনে হল যেন শচীন্দ্রনাথ সেই ঘোমটাপরা বউটির খোঁজে বেরিয়েছেন। আর তাঁর সমস্ত মনে এক পরম আনন্দের এবং অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের অনুভূতির ছোঁয়াচ লেগেছে।

আস্তে আস্তে সুনীলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আপিসে নিজের চেয়ারে বসে একখানা কাগজ টেনে তাতে লিখে ফেলল—

মানুষের মানসিক বিকৃতি যে কতরকমের হয়, তার ঠিকানা নেই। শচীন্দ্রনাথ অর্থবান এবং যশস্বী। অনেক সময়ে কেউ কেউ অর্থোপার্জনের জন্যে ভূতপ্রেত নিয়ে বুজরুকি করে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকমের। তাঁর প্রচুর অর্থ এবং হাতে অপর্যাপ্ত সময়। হয়তো কোনও কারণে জীবনাতীত রহস্য বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে ভূত প্রেত পর্যন্ত এসে তাঁর বুদ্ধির দৌড় থেমে যায়। এরকম অনেক সময়ে হয়। মানসিক উৎকর্ষ না থাকলে বিকৃত পথে প্রবৃত্তিগুলি পরিচালিত হয়। আগেকার দিনের রাজা-রাজড়াদের লাম্পট্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এই বিকৃত প্রকাশের একটা রূপ। রোজ রাত্তিরে ভূতের গল্প না শুনলে শচীন্দ্রনাথের ঘুম হয় না। অপ্রাকৃত আজ তাঁর জীবন এক প্রকৃত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাসখানেক পরের কথা।

সেদিন আপিসে আসতে সুনীলেশের একটু দেরি হয়েছিল। আসতেই মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছ থেকে একখানা চিঠি এসে উপস্থিত। স্বয়ং খোদকর্তার হাতে লেখা। তাতে লেখা রয়েছে, তিনি প্রায় আধঘণ্টা সুনীলেশের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। অত্যন্ত জরুরি কাজ। আপিসে এসে চিঠিখানা পেলেই যেন সে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে।

আপিস থেকে নিয়ে যাওয়া এবং পৌঁছে দেবার জন্যে একখানা গাড়ি থাকবে।

আজও আবার জরুরি তলব! সুনীলেশ ভাবছিল, শেষ পর্যন্ত চাকরি যায় কি থাকে তার ঠিক নেই! খামখেয়ালী ধনী মালিকের অনুগ্রহ বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। হয়তো সাময়িক কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু বড়োলোকের খেয়ালখুশির লাগাম ধরে চলা সাধারণ লোকদের কর্ম নয়। সহকর্মী বিনয় সেনও এর মধ্যে একটা মৃদু আভাষ দিয়েছে। অধ্যাপক মুরারি ঘোষের ইতিহাস এখনও খুব বেশি পুরোনো হয় নি। অথচ শচীন্দ্রনাথের আদেশ অমান্যই বা করা যায় কি করে— অন্ততঃ যতদিন চাকরিতে বহাল থাকা যায়, ততদিন।

সুনীলেশ একবার ভাবল, বিনয়ের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত পরামর্শ করা যাক্। সঙ্গেসঙ্গেই একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা মনে পড়ল। একটা Sub-editor-এর চাকরির জন্য আড়াইশো দরখাস্ত পড়েছে। নিজের নাহয় গুটি-দুই টিউশনি হলে চলে যাবে। কিন্তু পিসীমা? মাসে অন্ততপক্ষে দেড়শো টাকা তাঁকে দিতেই হবে।

গাড়িতে গিয়ে উঠতেই সোফার স্টার্ট দিল। মস্ত বড়ো গাড়ি। কে জানে গাড়িখানার কত দাম? পঞ্চাশ হাজারও হতে পারে হয়তো। ড্রাইভারের পোষাকটাও দেখাবার মতো। ড্রাইভারের সাজসজ্জায় মালিকের সম্মান বৃদ্ধি পায়। মোটরের নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে সুনীলেশ অনেক কথা ভাবতে লাগল। নিজেকে খানিকটা সস্তা

করে দিলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।—অনেক অর্থ, অনেক সুখ, আরও কত কি। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা আত্মসম্মান। অর্থের সঙ্গে ওই জিনিসটার কেমন যেন একটা সহজাত বৈরীতা আছে। অর্থের পরিমান বাড়তে থাকলে ওটা আস্তে আস্তে কেমন করে যেন উধাও হয়ে যায়।

বোধ হয় খাওয়াদাওয়ার পর শচীন্দ্রনাথ একটু বিশ্রাম করছিলেন। নীচে বসবার ঘরে এসে সুনীলেশকে তিনি আবার সেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। —এই যে তুমি এসেছ? তোমাকে আমার ভয়ানক প্রয়োজন। এমন-একটা কাজ এসে হাতে পড়েছে যা তুমি ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। দেখো, শেষ কালে তুমি আমায় যেন ডুবিও না সুনীলেশ। তোমার সবই ভালো, কিন্তু আমি তোমার Principleগুলোকে ভয় পাই। অবশ্য Principle আমাদেরও যে নেই তা নয়। বহু লোভ আমি জীবনে সংবরণ করছি।—না হলে হয়তো শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী আরও অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু আমি তোমার মতো একগুঁয়ে নই। Principle-এর সঙ্গে যখন' যুক্তি মিলিত হয়, তখনই তার মুল্য, নইলে সে জিনিসটার মতো ক্ষতিকর সংসারের আর কিছুই নেই।

কথাটা বলেই শচীন্দ্রনাথ মুচকি হাসলেন এবং সুনীলেশের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সুনীলেশ বলল— বোধ হয় জাগতিক ব্যাপারে আপনার কথাই সত্যি।

শচীন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন— আরে জগৎ নিয়েই তো আমাদের কারবার— আমরা কি আর অজাগতিক কিছু করতে যাচ্ছি! তাই তো বলি সুনীলেশ, Principleগুলোকে একটু পিছনে রাখো। তাই বলে আমি তোমাকে অসৎ বা অসাধু হতে বলছি নে।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। সুনীলেশ চায়ের কাপে কয়েকটা চুমুক দিতেই শচীন্দ্রনাথ পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করলেন।

টাইপ করা একখানা ফুলস্কেপ কাগজ। সুনীলেশের হাতে সেখানা দিয়ে তিনি বললেন, এটা পড়।

সুনীলেশ মনোযোগ দিয়ে কাগজখানা পড়ে বলল, পড়েছি স্যার। এইবার বলুন।

—ওইটে দেখে তোমাকে একটা ভালো খবর করে দিতে হবে—খুব ভালো। খুবই ভালো হওয়া চাই। যত ভালো হবে ততই আমার পক্ষে, মানে আমাদের কাগজের পক্ষে মঙ্গল।

—কিন্তু স্যার— ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এ তো দেখছি দুটো দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অসম্প্রীতির একটা ঘটনা। এ-খবরটার বিশেষত্বই বা কী আর এ নিয়ে আমাদের নূতন করে লিখবারই কী আছে? খবরটা এমনিতেই তো খুব ভালো করে edit করা রয়েছে। আমার তো মনে হয় না এতে কলম ছোঁয়াবার কোনো প্রয়োজন রয়েছে।

—তাই তো বলি, সুনীলেশ, তোমাদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধিও আছে, কিন্তু ব্যবসাদারী দৃষ্টিভঙ্গী নেই। দু-দেশের রাজনৈতিক অনৈক্যে অন্য এক দেশের সুবিধে হতে পারে তো।

সুনীলেশ বলল, স্যার, কিন্তু আমাদের কাগজে এ-খবর অত ফলাও করে ছেপে লাভ কি হবে বুঝতে পারছি নে। আমাদের সঙ্গে তো আর কারুর ভাবের অভাব হয় নি।

শচীন্দ্রনাথ আবার মৃদু হাসলেন এবং বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, এখন রাজনীতি আর বইয়ের পাঠ্য বিষয় নয়। এখন রাজনীতিতে এ-দেশ সে-দেশ নেই। কোথায় পাঁচ হাজার মাইল দূরে একটা দেশে নির্বাচন হবে, তার ওপর ফাট্‌কা করে কলকাতার শেয়ার বাজার ওঠানামা করছে। মাত্র বছরখানেক আগে এইরকম একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমি শেয়ার বাজার থেকে লাখকয়েক কামিয়ে নিয়েছি। তোমরা যে রাজনীতি ক্ষেত্রে একেবারে শিশু, তারই প্রমাণ আমার কাছে বার বার করে দিচ্ছ।

—স্যার, সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।

বলে সুনীলেশ বিস্ফারিত নেত্রে মালিকের দিকে চেয়ে রইল।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার কোনো প্রয়োজন দেখি নে। দুটো দেশের মধ্যে ঝগড়া বাধলে আমাদের দেশের কোনো কোনো লোকের হয়তো সুবিধে হতে পারে শুধু এইটুকুই আপাতত জেনে রাখো।

সুনীলেশ আর কথা বাড়ালো না। লেখাটা দিনতিনেকের মধ্যে শেষ করে দেবার আশ্বাস দিয়ে শচীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আপিসঘরে ঢুকেই সহকর্মী বিনয় সেনকে সে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল।

বিনয় সেন বলল, কিছু অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা না থাকলে শচীন্দ্রনাথ কখনো এত মাথা ঘামাতেন না।

সুনীলেশ বলল, কিন্তু কিসের লাভ? প্রবন্ধের জন্য অর্থ? কিন্তু সে কত? পঞ্চাশ-একশো-দুশো···। বিজ্ঞাপন নয় তো!

—হতে পারে। বিনয় সেন বলল। —আর যদি তা হয় তাহলে এ-রকম আরও বহু প্রবন্ধ লিখবার জন্যে অনুরোধ তোমার কাছে আসবে।

ওদিকে কাগজের আপিসে এক নতুন সাড়া জেগেছে। কর্মচারীরা বলছেন— গত তিন বছরে বিজ্ঞাপন থেকে আয় তিনগুণ বেড়েছে। মাইনে বাড়ে নি এক পয়সাও। এখন মাইনে বাড়াতেই হবে, নইলে মুশকিল। সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকদের ডেকে শচীন্দ্রনাথ সমঝে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কাগজের আয় যেমন বেড়েছে তিনগুণ, খরচাও বেড়েছে ততোধিক। অতএব মাইনে বাড়ানোর প্রশ্ন এখন আর আসতে পারে না।

এখানে-ওখানে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন চলতে লাগল। কখন যে ফেটে পড়ে ঠিক নেই। কাজ বেড়েছে। কাগজের আয়ও বেড়েছে। অথচ মাইনে বাড়াবার নামটি নেই।

শচীন্দ্রনাথ কর্মচারীদের ডেকে একদিন এক লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। আয় বেড়েছে—এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে ইনকাম ট্যাক্সের হার বেড়েছে। সুপার ট্যাক্স এবং expenditure ট্যাক্স চেপেছে। পাঁচ বছর আগে যে নীট আয় ছিল, আজ বর্ধিত রোজগার সত্ত্বেও তা আর বাড়ে নি। আবার ওদিকে ব্যাঙ্কগুলো সুদের হার বাড়িয়েছে। টাকা ধার পাওয়া মুশকিল। কর্মচারীদের এ-সব জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন।

দুই বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর লেখাটা নিয়ে সুনীলেশ যেদিন শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল, সেইদিন তিনি তাঁর কাগজের আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া ওর হাতে দিয়ে বললেন, সব দেখে শুনে তুমিই বল, আমার পক্ষে কি এখন মাইনে বাড়ানো সম্ভব?

সুনীলেশ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেল। ও জানত, ওটা নিয়ে তর্ক শুরু হলে সহজে থামবে না। একটা অকারণ ঝগড়াঝাঁটিও হয়ে যেতে পারে। তাই ও বলল, স্যার, কর্মচারীদের যেমন বেশি মাইনে চাইবার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি মালিকদের অধিকার রয়েছে না দেবার। কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কারণ দেখি নে।

শচীন্দ্রনাথও এ-কথার জবাব দিতে পারলেন না। একটু ভেবে বললেন, যদি চাও তোমার মতো দু-একজন কর্মীর মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাই বলে···

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুনীলেশ বলল, দোহাই স্যার, সে-উপকারটা এখন করতে যাবেন না। আর তাছাড়া, সবাইকে

মাইনে বাড়িয়ে না দিয়ে শুধু আমার মাইনে বাড়ানোটা অত্যন্ত অন্যায় এবং দৃষ্টিকটুও বইকি।

শচীন্দ্রনাথ জানতেন, ঠিক এই উত্তরই সুনীলেশের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। তবুও তিনি কথাটা একবার পেড়ে দেখলেন। তিনি জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছেন— লোভের একটা সহজাত বুদ্ধি এবং সম্মান ভ্রংশের ক্ষমতা আছে। অনেক উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে লোভের কাছে। যদি পৃথিবীতে বশীকরণের কোনও অমোঘ অস্ত্র থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে লোভ। সুনীলেশকে বার বার অর্থের লোভ দেখাতে দেখাতে হয়তো ওর মন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।

সুনীলেশ ততক্ষণে লেখাটা বের করে শচীন্দ্রনাথের হাতে দিয়েছে। শচীন্দ্রনাথ সেক্রিটারিয়েট টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটা পড়তে লাগলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুনীলেশ বুঝতে পারছিল লেখাটা তাঁর খুব ভালো লাগছে। সত্যিই তাই। নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতা দিয়ে পড়ে শচীন্দ্রনাথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, চমৎকার! অতি চমৎকার! সত্যি সুনীলেশ, এত তথ্য জোগাড় করলে কি করে? একেবারে সেই ১৮১২ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের একটা নাতিদীর্ঘ ইতিহাস। অপূর্ব, তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। কিন্তু শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট দিলেই তোমার লেখাটা সর্বাঙ্গ-সুন্দর হত।

—কোন পয়েন্টটা স্যার?

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তুটি দেশের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। এ-দেশে ওদের নিজের নিজের সমর্থকদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া কি পরিমাণ হয়েছে, সেই পয়েন্টটা। আমি তোমায় বলছি সুনীলেশ, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

—কিন্তু স্যার···। সুনীলেশ মাথা চুলকোতে লাগল। —ওদের সমর্থকদের খবর আমি পাব কোত্থেকে?

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তাকেই তো বলে Journalism। সবই যদি তুমি জানলে, তাহলে ইস্কুল-মাস্টার আর জার্নালিষ্ট-এর মধ্যে তফাত কোথায়? খোঁজখবর অবশ্যই তোমাকে খানিকটা নিতে হবে, র চেয়েও বেশি নির্ভর করতে । তোমার নিজের অন্তর্দৃষ্টির পর। তা যদি খানিকটা বা । লিখতে হয়, তাও ভালো। শুধু একটা কথা লিখতে ভুলো না— বিদেশের ভাবধারা থেকে যারা প্রাণের রস আহরণ করে, তারা সত্যিকারের দেশদ্রোহী। এ touchটা তোমার প্রবন্ধের শেষে থাকতেই হবে, নইলে তোমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে সুনীলেশ লেখাটা পকেটস্থ করে বেরিয়ে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই শচীন্দ্রনাথ বেশ খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি তো বরাবরই বলি— কিছুটা অসাধারণত্ব না থাকলে জার্নালিষ্ট হওয়া যায় না। জার্নালিজম্‌টাকে অধীতবিদ্যার একটা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগক্ষেত্র বলা যেতে পারে।

সেদিন রাত্রিবেলা সুনীলেশ ওর ডায়েরির একটা পাতায় লিখল— এই ধরনের অনেকগুলি প্রবন্ধের জন্যে আমি তৈরি হলাম। এগুলি থেকে শচীন্দ্রনাথের বহু অর্থোপার্জন হবে বলে আমার মনে হয়। গোলামী এখন নোংরা রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় চলেছি? নিজস্বতার ছাপ কি সব ধুয়ে মুছে যাবে?

একদিন এক সভায় গিয়ে অধ্যাপক মুরারি ঘোষের সঙ্গে সুনীলেশের দেখা হল। নিজের পরিচয় দিতেই অধ্যাপক হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন।

সুনীলেশ বলল, শুনলাম, আপনি এখন মফস্বলের এক কলেজে অধ্যাপনা করছেন?

মুরারিবাবু বললেন, করছিলাম তাই, কিন্তু এখন আর করছি না।

—তাহলে কি আবার কাগজের লাইনে আসছেন ?

—বলতে পারেন, একরকম তাই। তবে দৈনিক কাগজ নয় এবং অন্যের কাগজ নয়। এবার আর চাকরি নয়।

—অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ কাগজ চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করাটা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই বাজারে।

মুরারিবাবু মৃদু হেসে বললেন, উপায় ছিল না ভাই। কলেজী রাজনীতির আবর্তে প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম।

সুনীলেশ বলল, আবর্ত তো সব জায়গাতেই রয়েছে, তা সে কলেজই বলুন, খবরের কাগজই বলুন।

অধ্যাপক বললেন, কলেজেও রাজনীতি, স্রেফ রাজনীতি। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে ভারিক্কী চালে বললেন, ব্যাপার কি জানেন সুনীলেশবাবু, মন্ত্রী হবার বা দেশের নেতা হবার রাজনীতি বুঝি, কিন্তু দুশো টাকা মাইনের অধ্যাপকের চাকরির জন্যে রাজনীতির প্রয়োজন বুঝতে পারি না। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, চোদ্দজন প্রফেসরের ছোট্ট একটা কলেজে যে-রাজনীতি দেখেছি, তা এ-রাজ্যের বিধানসভার রাজনীতিকে হার মানিয়ে দেয়। ঘেন্না ধরে গেল, তাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম।

সুনীলেশের ভালোই লাগল অধ্যাপক মুরারি ঘোষকে। ইংরেজির অধ্যাপক। ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যে নাকি ভদ্রলোকের বেশ দখল রয়েছে। ভদ্রলোক কেতাদুরস্ত। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। জীবনে বড়ো হবার প্রবল ঝোঁক। বেশভূষা দেখে মনে হল, এরই মধ্যে যেন ভালো করে বাঁচবার একটা ইশারা খুঁজে পেয়েছেন।

সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল, তাহলে এবার নিজেই কাগজ বের করা স্থির করেছেন ?

—হ্যাঁ। Declaration নিয়েছি। একটা মাসিক পত্র বের করব ঠিক করেছি।

—পত্রিকাটির নাম দিলেন কী ?

—"নূতন দিগন্ত"। মুরারিবাবু বললেন।

—চমৎকার নাম হয়েছে। আপিস করলেন কোথায় ?

—আপাতত নিজের বাড়িতেই। তারপর দেখা যাবে। দুই-একটা লেখা দেবেন মাঝে মাঝে। আপনার কাছে যাব কিন্তু।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই সুনীলেশ ভাবতে লাগল— অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে মাসিক কাগজ চালানোর দায়িত্ব নেওয়া এই বাজারে বড়ো অদ্ভুত মনে হয়। বিশেষ করে সাহিত্যপত্রিকা চালানো রীতিমত দুঃসাহসিকতার কাজ। অধ্যাপককে দেখলে মনে হয় ওঁর জীবনে বড়ো হবার ঝোঁক বড়ো বেশি প্রবল। ভদ্রলোকের খানিকটা প্রতিভা হয়তো ছিল। কিন্তু প্রতিভাকে ঘষে মেজে প্রখরতর করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার— তার চাইতে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভের দিকে ঝুঁকছেন। সুনীলেশের বার বার মনে হতে লাগল অধ্যাপক হয়তো বা স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় শচীন্দ্রনাথের পিতা দৈনিক কাগজ বের করেছিলেন।

বাংলাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। শচীন্দ্রনাথের পিতা সুযোগ বুঝে ব্যবসার সঙ্গে রাজনীতির বেশ সুন্দর একটা স্বর্ণসূত্র গেঁথে ফেলেছিলেন। মাসের মাধ্যে পনেরো দিন কাগজ বাজেয়াপ্ত হত। মহামান্য ইংরেজ বাহাদুরের কোপ তখন বাংলা-দেশের প্রায় সব কাগজগুলোর উপর পড়েছিল— বিশেষ করে যারা অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। শচীন্দ্রনাথের পিতা

অমৃতেন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক হিসাবে খ্যাত হয়ে পড়লেন। বড়ো বড়ো নেতাদের বক্তৃতা ওঁর কাগজে ফলাও হয়ে বের হত। ছু-একবার অমৃতেন্দ্রনাথ নিজেও জেল খেটে এসেছিলেন।

পুত্র শচীন্দ্রনাথও প্রথম যৌবনে গরম গরম বক্তৃতা করেছেন। ছু-একটা গরম সম্পাদকীয়ও লিখেছেন। কিন্তু আজ তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। অমৃতেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তাঁরও হয়তো এই অবস্থাই হত। এককালে যখন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে ব্যবসা চলত না, তখন অমৃতেন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথ ছুজনেই বিপ্লবী ছিলেন; কিন্তু স্বাধীন ভারতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাগজের রূপটিও বদলেছে।

মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে কর্মচারীরা শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে সোজাসুজি আলাপ করতে চাইলেন।

শত হলেও শচীন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পারলেন, কর্মচারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া না করতে পারলেও, বসে তাদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি রাজী হলেন আলাপ করতে।

সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সুধেন্দু পাল আর ছুজনকে সঙ্গে নিয়ে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। সুধেন্দুবাবু শচীন্দ্রনাথের চাইতে বয়সে অনেক বড়ো— তাঁর বাবার আমলের কর্মচারী। তিনি যখন অমৃতেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে তাঁর বাড়িতে যেতেন, তখন শচীন্দ্রনাথকে দেখেছেন হাফপ্যাণ্ট পরা ইস্কুলের ছেলে। তাই তিনি শচীন্দ্রনাথকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন।

সেদিন আলোচনা সভা বসতেই শচীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে সুধেন্দুবাবু বললেন, শচীন্দ্র, তোমার কাগজের জন্য আমরা জীবন-

পাত্ত করেছি। তুমি যদি আমাদের দিকে না তাকাও, তাহলে আর তাকাবে কে ?

শচীন্দ্রনাথ একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে চোখ বুঁজে ফেললেন। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন, সুধেন্দুবাবু, আমি কাগজের মালিক। আপনি আমার কর্মচারী। আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করুন।

সুধেন্দুবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কি বললে শচীন্দ্রনাথ ? তোমার বাবা বেঁচে থাকলে এর যোগ্য উত্তর পেতে।

—আমি যা বলেছি অনেক ভেবেচিন্তেই বলেছি। শচীন্দ্রনাথ বললেন ।

—পয়সার গরমে তোমার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হতে বসেছে।

বলে সুধেন্দুবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সঙ্গী তুজনও উঠে এল।

তখনও শীতের আমেজ আছে। বসন্ত আসি-আসি করেও আসছিল না। গাছে গাছে কেবল নতুন পাতা গজানো শুরু হয়েছে। ফুলের কুঁড়িরা উঁকি মেরে দেখছে— কখন বসন্ত আসবে, আর তারা ছুটে বেরিয়ে আসবে বাইরে। কোকিলরা ভুলে তু-একবার ডেকেও ফেলেছে। এই বুঝি বসন্ত এল।

এমন সময় খবর এল এক মহামান্য অতিথি আসছেন। অনেক দূর দেশের মানুষ তিনি। তিনি এ-দেশে আসিবেন বললে ঠিক বলা হয় না। বলতে হয়, ও-দেশ থেকে এ-দেশে তাঁর শুভ পদার্পণ হবে।

কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে জানালেন, মহামান্য অতিথির সম্মান রাখতে হবে। গৃহে গৃহে আলোকসজ্জা হবে, রাস্তার মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো তোরণ হবে। কলকাতা শহরটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। শহরটা বড্ড নোংরা। যে রাস্তা দিয়ে মহামান্য

অতিথি আসবেন সে-রাস্তার দু-পাশের বস্তিগুলোকে নিয়েই যত মুশকিল হয়েছে। যেন কতকগুলি মূর্তিমান রসভঙ্গ সব দাঁড়িয়ে আছে। অতিথি যেন আমাদের দারিদ্র্য চোখে দেখতে না পান— আমাদের মলিনতা তাঁর চোখকে যেন পীড়া না দেয়।

বাজেট পাস হল— কয়েক কোটি টাকার। যত টাকা লাগে লাগুক, কুছ্ পরোয়া নেই! এত বাজারে ধার— যদি আরও কিছু ধার হয় কিছু এসে যায় না! যা করেই হোক দেশের সম্মান রক্ষা করতে হবে।

মহামান্য অতিথির খাবার তৈরি করবার জন্য পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, হল্যাণ্ড এবং স্পেন দেশ থেকে পাচক আনবার ব্যবস্থা হল। তিনি যে বাড়িটায় থাকবেন সেটাকে মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ঢেকে ফেলবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের কাশ্মীরী কার্পেট কেনা হল।

এ ছাড়াও অতিথির সঙ্গে যে ২৩৬ জন ভৃত্য এবং অনুচর আসবেন, তাদের জন্যেও ব্যাপক প্রস্তুতি করা হল। এদের মধ্যে ছিল ১৮ জন শয্যানুচর, ১২ জন পার্শ্বরক্ষক, ১৩ জন দেহসজ্জাকারী।

এলাহি কারবার বটে! খবরের কাগজগুলি ইতিমধ্যেই মহামান্য অতিথির জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কোথায় পড়েছেন, খেয়েছেন, নেচেছেন— তিনি কি রঙের জামা পছন্দ করেন— কোন নট নটী তাঁর প্রিয়। মাত্র দু-একটা কাগজ অতিথি-সংবর্ধনার এই বিরাট এবং ব্যাপক আয়োজনের সমালোচনা করল। কিন্তু তখন দেশের আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ এদের তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উচ্চস্থানীয় কর্তাব্যক্তিগণ এইসমস্ত কাগজ সম্বন্ধে বললেন— uncultured, অতিথির সম্মান দিতে জানে না।

কয়েকজন বুদ্ধিজীবিও প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা বললেন— দরিদ্র দেশের পক্ষে অর্থের এ অপচয় ভয়ানক অন্যায়। অতিথিকে আমরা সর্বদাই আমন্ত্রণ করতে রাজী, কিন্তু আমরা যা নই, তা দেখানোর এই চেষ্টা করার মতো উৎকট আর কিছু হতে পারে না।

এঁদের সম্বন্ধে কর্তারা বললেন— Disgraceful! রাজধানীর এক বিশিষ্ট কর্ণধার তাঁর রিপোর্টে লিখলেন— এ দেশের লোকদের দৃষ্টি সংকীর্ণ। মহামান্য অতিথির মর্যাদা রাখবার প্রচেষ্টার তাৎপর্য এরা বুঝতে পারে না।

ঠিক যেদিন মহামান্য অতিথি আসবেন, তার একমাস আগের কথা। কলকাতার ধনীরা সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় যে পাড়ায় বাস করেন, ঠিক তারই পিছনেরই একটা বস্তি বাড়িতে অনুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে স্ত্রী এবং দুটি শিশুকে হত্যা করে নিজের ভবলীলা সাঙ্গ করল।

এটা স্টাফ-রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষের scoop। কাগজে খবর বেরুলো। Chamber of Commerce-এর সভা বসল— প্রস্তাব গ্রহণ হল। এ মৃত্যু বড়ো নিদারুণ। পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থার এটা একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ক্রমাগত বাংলা-দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে যেভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে, অনুতোষ ব্যানার্জীর মৃত্যু তারই শোচনীয় পরিণতি।

রাজনৈতিক পার্টিগুলি শোক প্রস্তাব পাস করল। নেতারা বললেন— অনুতোষ তাদের কেউ নয়। কিন্তু এ মৃত্যুটা এত সাংঘাতিক যে এটা একটা জাতীয় আকার পরিগ্রহ করেছে। চাই কি আগামী নির্বাচনে এটা একটা বিশেষ বক্তব্যের বিষয়ও হতে পারে।

সরকারী পরিসংখ্যান আপিসে আরও একটা আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ল। কাগজে বেরিয়েছিল— ক্রমাগত অনশনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনুতোষ সপরিবারে আত্মহত্যা করেছেন। পরি-সংখ্যান বিভাগের রেজিস্টারে মৃত্যুর কারণ নির্দেশক column-এ লেখা হল— Acute Melancholia.

বাংলাদেশের এক অখ্যাত গ্রামের একটা প্রাইমারী ইস্কুলের

শিক্ষক ছিল অনুতোষ। ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়তে পারে নি। তার পিতাও ঐ ইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুতোষ তাঁরই স্থানে চাকরিতে ঢুকেছিল।

কিন্তু গ্রাম্য শিক্ষকের জীবনে নিদারুণ দৈন্য। শহরের শিক্ষকেরা দু-একটা টিউশনি পায়; গ্রামে তাও জোটে না। সরকারী সাহায্য অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছয়। একমাত্র ভরসা গ্রামের মুদীখানা। সেখান থেকে ধারে জিনিস কিনতে না পারলে শিক্ষকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। তাই একদিন অনুতোষ বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে আসে। বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে মাসকয়েক থেকে চাকরির চেষ্টা চলতে থাকে। সে এক নিদারুণ এবং দুঃসহ সংগ্রামের ইতিহাস।

তারপর চাকরি জুটল। অনুতোষ বাসের conductor হল। প্রথমে খুব খারাপ লেগেছিল অনুতোষের। মাস্টারী থেকে সোজা বাস-কণ্ডাক্টরি। কেমন যেন বেমানান মনে হত, কিন্তু উপায় নেই। আজকাল অনেক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেই এ-চাকরি করছে। খাকীর প্যাণ্ট আর বুশ সার্টের মধ্যে ওরা নিজেদের ঢেকে রেখেছে। প্যাসেঞ্জারদের গালাগাল শুনছে। কিন্তু ওদেরও একদিন আভিজাত্য ছিল। তখন বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের জমি ছিল, জমিদারী ছিল। আজ সব-কিছু কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। কলকাতা শহরে তাই শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা কাঁধে চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে চাকরি করে।

এটা একটা বৃহত্তম সামাজিক বিপ্লব। এর জন্যে প্রচুর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে— অনেকে তার খবর রাখেন না। গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলেছে, কিন্তু কালের হিমশীতল স্পর্শে সে-আগুন নিভে গেছে। হয়তো ক্রমে একেবারেই নিভে যাবে।

অনুতোষের বৈচিত্র্যহীন জীবন কোনোরকমে কাটে। সে ভেবেছিল, দিনের বেলা চাকরি করে রাত্তিরে আই. এ. কিংবা আই.

কম. পড়ে নেবে। কিন্তু তা হল না। ডিউটির গোলমালে সময় করে উঠতে পারল না। অশান্তি অভাব আর অভিযোগের বোঝায় জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। মাইনে বাড়ে না— জিনিসের দাম বাড়ে। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। চাকরি থাকবে না। একদিন ছেলেকে ফেলে অনুতোষের মা স্বর্গে চলে গেলেন। অনুতোষ মুষড়ে পড়ল। কিন্তু আবার মৃত্যুর ছায়ায় জীবনের কল্লোল ভেসে আসে। আস্তে আস্তে তার জীবনের ধারা বদলায়। একদিন তার ঘরে আসে অনিমা। বাঙালীর গৃহস্থঘরের মেয়ে যেমনটি হয়, অনিমাও ঠিক তেমনি এক মেয়ে। উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ, স্বপ্ন সবই আছে।

বছরের পর বছর চলে। আবার জীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে। অনিমার দুটি সন্তান হল। বাস কন্ডাক্টরের সংসার চলে না। ছেলেদের দুধ জোটে না! অনিমার অ্যানিমিয়া রোগের চিকিৎসা হয় না। প্রথমে বেদনা, তারপরে হতাশা। তারপর শেষ পর্যন্ত জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধা।

প্রতিবাদ করা মুশকিল। কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে মূকের মুখেও ভাষা ফোটে। Bus conductor-রা দাবি জানাল মাইনে বাড়াতে হবে। জিনিসের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। মাইনে বাড়ল না; অনুতোষের এবং আরও কয়েকজনের চাকরি গেল।

আবার চলল অনশনের পালা। এবার অনুতোষ একা নয়। সঙ্গে আরও তিন জনের জীবন গাঁথা।

কলকাতা শহরে চাকরি গেলে কেউ আর চাকরি পায় না। তাই অনুতোষও আর চাকরি পেল না। তারপর জীবন-সংগ্রামের কষাঘাত খেতে খেতে আর কোনো পথ না পেয়ে অনুতোষ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হল। একখানা বাংলা হোমিওপ্যাথিক বই আর কয়েকশিশি ওষুধ সম্বল করে অনুতোষ নতুন জীবন শুরু করল।

কিন্তু ডাক্তারকেই বা ডাকে কে? পাড়ায় অনুতোষের মতো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আরও গণ্ডা-দুই রয়েছে। ভিজিট মেলে না, এমনকি ওষুধের দামও মেলে না।

ক্রমাগত অনশন আর দুশ্চিন্তায় অনিমা নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে অনশনের রোগ সারে না। আস্তে আস্তে মায়ের সাথে ছেলেমেয়ে দুটোও মৃত্যুশয্যায় পড়ল।

ঘটনার পরে সুনীলেশ যখন অনুতোষদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল তখন পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রমহিলা বললেন, আজ অসময়ে অনুতোষবাবু বাড়তে ফিরেছিলেন। এ সময়ে কখনও তিনি ফেরেন না। আমি আর কিছুই জানি না। তবে বেলা তিনটে নাগাদ অনুতোষবাবুর ছোট্ট মেয়েটাকে বলতে শুনেছি— "বাবা আমি অষুধ খাবো।" তার পর পাঁচটার সময় ঠিকে ঝি কাজ করতে এসে ঘটনাটা আবিষ্কার করে। মনে হয়, ডাক্তার এক-এক করে সবাইকে বিষের পুরিয়া খাইয়ে সবার শেষে খায় নিজে।

সুনীলেশ অনুতোষের বাড়ির থেকে যখন রাস্তায় বেরুলো তখন অভিজাত পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে আলো আর পতাকার সমাবেশ। আদেশ এসেছে, মাননীয় অতিথি এলে রাস্তাটা কেমন দেখাবে তার একটা রিহার্সেল দিতে হবে। ততক্ষণ আলোর রাজত্ব ত্যাগ করে ইস্কুল মাস্টার ওরফে বাস-কণ্ডাক্টর ওরফে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অনুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবার এক হিমশীতল অন্ধকারের রাজত্বে অভিযান শুরু করেছে।

সুনীলেশ অনুতোষের সম্বন্ধে লিখল—অনুতোষ কাপুরুষের মতো মরে নি। পাঁচ বছর ধরে জীবনের সঙ্গে অমানুষিক সংগ্রাম করে তবে মৃত্যুবরণ করেছে। এ-সংগ্রামের ইতিহাস হয়তো কেউ জানবে না— ইতিহাসের পাতায় থাকবে না এর নাম। কিন্তু তবুও অনাগত জীবনের বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় তার নাম অদৃশ্য অক্ষরে লেখা থাকবে।

মাধবী আবার একদিন সুনীলেশের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হল। বিদ্যাধর এখন সুস্থ হয়েছে। কাজকর্ম করছে আগেকার মত।

সুনীলেশ জানত, মাধবী বিদ্যাধরকে দিয়ে দু-একটা কাজ করিয়ে নেয়। যতই দরিদ্র হোক, বাঙ্গালী ঘরের সোমত্ত মেয়ে যখন তখন রাস্তায় বেরুতে পারে না। অন্ততঃ ওদের মত মেয়েরা নয়।

সুনীলেশকে ঢুকতে দেখেই মাধবী পালাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। শত হলেও অন্যের ভৃত্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটা যে খুব ভাল কথা নয় তা মাধবী জানত। বিদ্যাধর কিন্তু জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করেছিল। সুনীলেশের জন্যে কতটুকুই বা তাকে কাজ করতে হতো! মাধবী এসে দু-একটা ফুট ফরমাস করলে ওর ভালই লাগত।

সুনীলেশ মাধবীকে অসুবিধেজনক লজ্জার হাত থেকে রেহাই দিতে চাইল। এতে ওরই বা আপত্তি কি? করুক না বিদ্যাধর মাধবীদের জন্যে কিছুটা কাজ! সারাদিন তো বসেই থাকে!

এর মধ্যে বিদ্যাধর এগিয়ে এসে সুনীলেশকে বলল, বাবু, আমি একটু বাজার যাচ্ছি। দিদিমনিদের একটা কাজ আছে। এসে আপনাকে চা আর খাবার করে দিচ্ছি।

সুনীলেশ কথা বলল না। শুধু ভাবল, এরই মধ্যে অতি সহজে মাধবী বিদ্যাধরকে হাত করে ফেলেছে।

মাধবীও ঘটনাটাকে উপেক্ষা করল না। আস্তে আস্তে সুনীলেশের কাছে এগিয়ে এসে বলল, সুনীলেশদা, আমি বিদ্যাধরদাকে একটু বাইরে পাঠাচ্ছি। আপনি বাড়িতে ছিলেন না, তাই আপনার অনুমতি নেওয়া হয় নি।

সুনীলেশ বলল, না, না, তাতে কি, তাতে কি? তুমি যখন খুশি তখন বিদ্যাধরকে বাইরে পাঠাতে পার, আমার কোনও আপত্তি নেই। এতে আবার অনুমতির প্রয়োজন কি?

মাধবী বিদ্যাধরের হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে ওর সঙ্গেই সুনীলেশের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ সুনীলেশ বসে বসে মাধবীকে দেখছিল। মাধবী সুন্দরী, বেশ সুন্দরী। আর তা

ছাড়াও ওর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে—যা সহস্র মেয়ের থেকে ওকে আলাদা করে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে মাধবীর অটুট স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের সঙ্গে মুখশ্রীর সংযোগ ঘটলে ও-বয়েসের মেয়েদের যতটা লাস্যময়ী করে তোলে, ওর বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

সুনীলেশের সবচেয়ে ভালো লেগেছে মাধবীর পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। এর আগে সুনীলেশের সঙ্গে ওর মাত্র একবার দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় দর্শনেই মাধবী ওকে আপনার করে নিয়েছে। বিদ্যাধরের তো কথাই নেই। মাধবীর প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ। অমন মেয়ে হয় না— মুখে রা নেই— নীরবে মামীমার ফুটফরমাস খেটে যাচ্ছে। মামাতো ভাইবোনদের স্নান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, তদারকী করছে। সব সময়ে মুখে হাসি। মামীমা যখন গালাগালি করেন, তখন ও হেসে বাঁচে না। মামা যখন বলেন— মাধবী তোকে এবার পার করতে পারলে বাঁচি, সুষমা কি বোঝাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে— তখনও মাধবীর চোখেমুখে হাসি উপচে পড়ে। খুব কম মেয়েই ওর মতো করে জীবনটাকে এমন সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে।

মিনিট দশেকের মধ্যে মাধবী আবার এল। হাতে এক কাপ চা আর এক প্লেট চিঁড়ে ভাজা।

সুনীলেশের সামনে একটা টেবিলের ওপর প্লেট আর কাপটা রেখে মাধবী বলল, সুনীলেশদা, আপনার জন্যে চা নিয়ে এসেছি।

সুনীলেশ দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করল। নিজের সংসার নেই। বারো বছর আগে মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে এমন করে কাছাকাছি এসে দরদ দিয়ে কোনও নারী ওকে ডাকে নি, কথা বলে নি। ও বলল, ছি ছি! মাধবী, এ আবার তুমি কি করলে? এক্ষুনি তো বিদ্যাধর এসে যাচ্ছে, তুমি আবার এসব আনতে গেলে কেন?

মাধবী হাসতে হাসতে বলল, আপনার বুঝি চা খাবার ইচ্ছে নেই?

—না তা থাকবে না কেন? সুনীলেশ বলল।

—তবে আপনি ওসব কথা বলছেন কেন?

সুনীলেশ দেখল উপায় নেই। চা আর চিড়ে ভাজা খেতেই হবে। যতক্ষণ সুনীলেশ চা খেল, ততক্ষণ মাধবী দূরে ছাদের বারান্দায় একটা থামের সঙ্গে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চা খাওয়া হলে, নিঃশব্দে ঘরে এসে কাপ আর ডিসটা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

সুনীলেশের মনে হতে লাগল, অনেক দিন ধরে মরুভূমি ঘুরে হঠাৎ শস্যশ্যামলা দেশে প্রবেশ করলে চোখদুটো যেমন করে জুড়িয়ে যায় তেমনি সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিকেল বেলা মাধবীকে একবার দেখলে সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। মাধবী চৈত্রের আগুনঝরা পলাশ নয়, বর্ষার রজনীগন্ধা।

সুধেন্দুবাবু চাকরি ছেড়ে দেবার পর আপিসের আবহাওয়াটা বেশ খানিকটা বদলেছে। যারা অপেক্ষাকৃত বেপরোয়া, তারা বলল—ধর্মঘট করা উচিত ছিল। যাদের কাঁধে বিরাট সংসার, এবং বয়েস হয়েছে, তারা বলল— বুঝি তো সবই, কিন্তু শচীন্দ্রনাথ যে-রকম প্রতিশোধপরায়ণ, তাতে সাহস পাই না। সুধেন্দুবাবু সম্বন্ধে সকলেরই সমান সহানুভূতি। ভদ্রলোকের ষাট বছর বয়স হয়েছে। এই কাগজে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করেছেন। ওঁর কোনও শত্রু ছিল না। এককালে দেশসেবক ছিলেন, জেল খেটেছেন। তখনকার দিনের গ্র্যাজুয়েট। ইচ্ছে করলে ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের পিতার কাগজে নামমাত্র মাইনেতে চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন।

সহকর্মী বিনয় সেনকে সুনীলেশ বলল, সুধেন্দুদার ওপর তরবারি পড়েছে। ওটা একটা বিপদ-সঙ্কেত। প্রয়োজনবোধে তোমার-

আমার ওপরেও আঘাত আসবে। যদি লড়তে পার লড়, নইলে শুধু কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে শত্রুতা বাড়িও না।

বিনয় বলল, চল সুনীলেশ, সুধেন্দুদাকে একবার দেখে আসি। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েছেন। অতবড় একটা সংসার ঘাড়ে, অথচ চাকরি নেই।

হঠাৎ এর মধ্যে আবার সুনীলেশের টেলিফোন এল। অধ্যাপক মুরারি ঘোষ ফোন করেছেন। আজই একবার ওঁর আপিসে গিয়ে দেখা করলে বড় ভালো হতো। না এলেই নয়।

সুনীলেশের কিন্তু যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক ভদ্রলোক বয়োজ্যেষ্ঠ; মাত্র কয়েকদিন হয় আলাপ হয়েছে। এত অনুরোধের পরেও না গেলে, ব্যাপারটা বড্ড খারাপ দেখায়। হয়তো ভদ্রলোক কিছু মনেও করতে পারেন। তাই সুধেন্দুবাবুর বাড়িতে যাওয়াটা সেদিনকার মতো স্থগিত রাখতেই হলো।

সুনীলেশ নূতন দিগন্তের আপিসে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অভিজাত পাড়ার রাস্তায় তখন আলোর ঝিলিমিলি। একটা বিরাট বাড়ির তিনতলায় সাহিত্য পত্রিকার আপিস। সুনীলেশ ঢুকেই হকচকিয়ে গেল। নূতন দিগন্ত তো ভালো, পঞ্চাশ বছর ধরে যে-কাগজ বাংলাদেশের আসর জমিয়ে রেখেছে, সে-কাগজও ও-রকম আপিস খোলবার কথা কল্পনা করতে পারে না। তিনখানা প্রশস্ত ঘর। ঘরের ফার্নিচারগুলো চেয়ে দেখবার মতো। মেহগিনির পালিশ আর নিওনের আলো মিলিয়ে সারা আপিসটা চক্‌চক্ করছিল। নূতনতম কায়দায় আলমারিঠাসা বই। মাঝখানের ঘরটায় একটা বিরাট টেবিল। তার ওপর দেশ-বিদেশের সব পত্রিকা সাজানো। টেবিলের দুধারে বসবার চেয়ার। মনে হয় একটা লাইব্রেরি।

তিনটি ঘরই ডিসটেম্পার করা। জানলায় দামী পর্দা। যেখানেই একটু খালি জায়গা রয়েছে, সেখানেই রঙিন ফুল

ভর্তি টব। বসন্তের সান্ধ্য আমেজ সারা আপিসটাকে কেমন যেন স্বপ্নময় করে তুলেছিল।

সুনীলেশ ঘরে ঢুকতেই সম্পাদক, অধ্যাপক মুরারি ঘোষ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আশ্চর্য, একমাসের মধ্যে অধ্যাপকের চেহারাটা পর্যন্ত বদলে গেছে। যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, তখন মুরারি ঘোষ বলেছিলেন নিজের বাড়িতেই পত্রিকার আপিস করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে এই বিরাট আপিসে উঠে আসা ওর কাছে যেন বড়ো অদ্ভুত ঠেকল। মনে হলো, আলাদিনের দৈত্য দুশো টাকা মাইনের অধ্যাপককে একেবারে কাঁধে করে তুলে নিয়ে কোনো যক্ষের কোষাধ্যক্ষ করে দিয়েছে। মুরারি ঘোষ এখন অন্য রাজত্বের লোক—সে-রাজত্বে অপর্যাপ্ত অর্থ এবং ভাবনাবিহীন জীবন।

সুনীলেশ কিছু বলবার আগেই অধ্যাপক মুরারি ঘোষ বললেন, এখনও আমার কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরোয় নি। দু-তিনদিনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে আশা করি। জানেন তো, আমাদের দেশের ছাপাখানার ব্যাপার! কোনোদিনই কথামত কাজ হয় না।

সুনীলেশ এই প্রথম মৌনতা ভঙ্গ করে বলল, আপনার আপিসটি ভারি সুন্দর, মুরারিবাবু।

অধ্যাপক একটু টানা হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে জায়গাটা ভালোই পেয়েছি। এখন ভালোয় ভালোয় কাগজটা ঠিকমত বের করতে পারলেই হয়। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, বড্ড খরচা হয়ে গেছে। কেবল ফার্নিচার এর জন্যেই লেগেছে দশ হাজারের ওপর ; এ ছাড়াও মাসে ভাড়া গুণতে হবে সাড়ে ছশো।

সুনীলেশ তখন ভাবল, শচীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মতো বিরাট দৈনিক সংবাদপত্রের মালিকও এ-কথা শুনলে এতক্ষণে মূর্চ্ছা যেতেন।

ও বলল, আপিসটা দেখলে মনে হয়, আপনি অনেকদিন আগে থেকেই রীতিমত প্ল্যান কষে বেশ আঁটঘাঁট বেঁধে তারপর কাজে নেমেছেন।

অধ্যাপক বললেন, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে আমার এখানে আরও দু-একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যদিও আমিই সেগুলির কর্মকর্তা, তা হলেও টাকাপয়সার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি।

সুনীলেশ চুপ করে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা এত অদ্ভুত আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল যে ওর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি।

কফি এল, সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ। আরও এল এক টিন দামী সিগারেট। অনেক দিন এমন সুন্দর পেয়ালায় সুনীলেশ কফি খায় নি। তকমা আঁটা বয়-বেয়ারাদের আনাগোনা সম্পাদকের আপিসটাকে একটা বিশেষ আভিজাত্যের ছাপ দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক মুরারি ঘোষ আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, সুনীলেশবাবু, প্রবন্ধ এবং রচনা লেখায় আপনার খ্যাতি আছে। আমার নূতন দিগন্তের প্রথম সংখ্যায় আপনাকে একটা ভালো প্রবন্ধ দিতে হবে। এ-অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।

সুনীলেশ বলল, অধ্যাপক, এর জন্যে এত অনুরোধ করবার কি আছে? একটা প্রবন্ধ আপনার জন্যে লিখে দেব, তা আর এমন কি মুশকিলের কাজ? কিন্তু আমি তো সাহিত্য বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। আপনি তো জানেন সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এখন লিখবার আর ক্ষমতা নেই। আমরা হচ্ছি সব চুটকি লেখক। আমাদের সবটাই stunt। হঠাৎ পাঠকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ। আর তাছাড়া বুঝতেই তো পারেন, খানিকটা রং চড়ানো আমাদের একটা বিশেষ ধর্ম। এই সব করে করে আমার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আপনি যদি সিরিয়াস কিছু লিখতে বলেন, তাহলে আমি নাচার। পারব না এ-কথা বলছি না, কিন্তু তার জন্যে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষ মুচকী হেসে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটা লেখা চাই। এর সঙ্গে

সাহিত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। বরং বলতে পারেন সেটা একটা অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ।

—বলুন, সুনীলেশ জিজ্ঞেস করলো।

অধ্যাপক ঘোষ বললেন, Private আর Public Sector-এর ওপর একটা তুলনামূলক প্রবন্ধ।

সুনীলেশ সোজা হয়ে বসল। সাহিত্য পত্রিকায় এ-রকম প্রবন্ধ কেউ চাইতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

সুনীলেশের অবস্থাটা বুঝতে পেরে মুরারি ঘোষ বললেন, সত্যি কথা বলতে কি সুনীলেশবাবু, এ সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ। আপনি তো জানেন, আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম। ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছি। সত্যি বলছি, আমার এ-ব্যাপারে ধারণা বড়োই অস্পষ্ট।

সুনীলেশ কথা দিল, দিন-তিনেকের মধ্যে সে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেবে। মুরারি ঘোষ সুনীলেশের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, সত্যি, সুনীলেশবাবু, আপনি আমার যে কি উপকার করলেন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

তারপর সুনীলেশের যাবার সময় হলে অধ্যাপক মুরারি ঘোষ বললেন, সুনীলেশবাবু, প্রবন্ধটার সঙ্গে দয়া করে আপনার পারিশ্রমিকের কথাটাও জানিয়ে দেবেন। একটা চেক্ পাঠিয়ে দেব।

সুনীলেশ ভাবল, বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্যে চেক্! এর চাইতে অবিশ্বাস্য ব্যাপার খুব কমই হতে পারে।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষ যে কোন স্রোতে জীবনতরী ভাসিয়েছেন, তা বলা মুশকিল। তবে তিনি যে আলাদিনের প্রদীপের সন্ধান পেয়েছেন, তা হলফ করে বলা চলে।

দিন দুই পরের কথা। রাত্রি নটা নাগাদ বাড়ি ফিরতেই সুনীলেশ

দেখতে পেল, অধ্যাপক মুরারি ঘোষ ওর ঘরে বসে আছেন। বিদ্যাধর বলল, বাবু ঘণ্টা দুই হলো এসেছেন। চা দিয়েছি।

সুনীলেশ ঘরে ঢুকেই বলল, আরে, এ গরীবের ঘরে হঠাৎ পদার্পণ— ব্যাপার কি অধ্যাপক ?

মুরারিবাবু মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললেন, সেদিন প্রবন্ধটা সম্বন্ধে আপনাকে সব কথা বলা হয় নি ; তাই এই অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম। ছি ! ছি ! আমারই লজ্জা করছে। সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি ফিরলেন— কোথায় একটু বিশ্রাম করবেন, না, আমি আবার জ্বালাতে এলাম।

সুনীলেশ অস্বস্তি বোধ করল। বলল, অধ্যাপক, আপনি আমার অতিথি। অতিথি দেবতা। নির্ভয়ে আদেশ করুন। সম্ভব হলে পালন করব।

মুরারি ঘোষ বললেন, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। আপনাকে Private আর Public Sector সম্বন্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলাম, সেইটে সম্বন্ধে একটুখানি আলাপ করতে এলাম। তার পর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, লেখাটা কিভাবে লিখবেন, জানতে পারলে সুখী হতাম।

সুনীলেশ অনেকটা অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, কেন ? official line······

মুরারি ঘোষ না বোঝবার ভান করে সুনীলেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—একটাই তো লাইন আছে, অধ্যাপক। সুনীলেশ বলল, প্ল্যানিং কমিশনের লাইন।

—ঐখানটাতেই আমার একটু আপত্তি ছিল। দেখুন সুনীলেশবাবু, আপনি তো অর্থনীতি বোঝেন ভালো। আমি যদি এমন কতকগুলি নির্ভুল তথ্য দিতে পারি, যা দিয়ে আপনার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে Private Sector

অনেক বেশি কর্মপটু এবং দক্ষ, সেগুলো আপনি কাজে লাগাতে পারবেন তো ?

সুনীলেশ বেশ বুঝতে পারল সমস্ত জিনিসটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন দেখছি অধ্যাপক। আমি Private Sector-এর পক্ষে সবকিছু বলতে পারি, কিন্তু Public Sector এর বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারব না।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষের মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—অনেকটা বিবাহ ভেঙে গেলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখটা যেমন দেখতে হয়। ভদ্রলোক অনেক আশা করে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে সুনীলেশই এবারকার মতো তাঁর উদ্ধারকর্তা। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধটা না বেরুলে হয়তো বা সাড়ে ছ'শো টাকা ভাড়ার আপিস, নিওন আর season flower-এর সমারোহ, বসন্তের দোলা লাগা পুরু হ্যাণ্ডলুমের পর্দা, সুইং চেয়ার সব ভেস্তে যাবে। তাই তিনি বেপরোয়া হয়ে সুনীলেশের হাতটা হঠাৎ ধরে বললেন, সুনীলেশবাবু, আপনি আমার ছোটো ভায়ের মতো! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে ভেঙে দেবেন না।

সুনীলেশ মনে মনে হাসছিল। যে-বিরাট মহীরুহের মুরারি ঘোষ একটি শাখামাত্র, সুনীলেশ ভাবছিল সেই মহীরুহের কথা। সে মহীরুহ তার হাজার শাখা-প্রশাখা ইতিমধ্যেই সমাজের সকল স্তরে বিস্তার করে দিয়েছে। শচীন্দ্রনাথ এখনও হয়তো তার খোঁজ পান নি। পেলেও সহজে অমন একটা প্রবন্ধ ছাপাটা সুবিচার। প্রণোদিত কাজ বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক। জনমতের ভয় তাঁর আছে। তিনিও জনমত সৃষ্টি করেন ; কিন্তু যে-ব্যাপারে জনমত জাগ্রত, সে-ব্যাপারে তিনি খুব কৌশলে চলেন। একবার একটা সমস্যা নিয়ে তাঁকে জনমতের বিরুদ্ধে লিখতে বলা হয়েছিল। তিনি বেঁকে বসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত

অবশ্য দিন-তিনেক ধরে পক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি 'সম্পাদকের চিঠি'র কলামে ছাপাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যেও অবশ্য কৌশল ছিল। বিরুদ্ধ মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথও অর্থের ব্যাপারে আত্মবিক্রয় করে থাকেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে ত্যাগ করে নয়। নীতিহীনতারও তাঁর একটি নীতি আছে। অধ্যাপক মুরারি ঘোষ কোথাও নিজেকে এমনভাবে আত্মবিক্রয় করেছেন যে স্বাতন্ত্র্যের লেশমাত্র আর বেঁচে নেই। অর্থের লালসা তাঁর আর সমস্ত প্রবৃত্তিকে রাহুর মতো গ্রাস করে ফেলেছে।

মুরারি ঘোষ পকেট থেকে একখানা সইকরা blank cheque বের করে সুনীলেশের হাতে দিয়ে বললেন, এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রবন্ধটা একটু ঘুরিয়ে লিখতেই হবে।

সুনীলেশ চেকটা ফেরত্ দিল। অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে দুদিনের আলাপ। ওঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই এর মধ্যে ভাবা হয়ে গেছে। বেশির ভাগই আন্দাজ; তবে ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সুনীলেশ অনেক আন্দাজের সত্যতা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। কিন্তু এই চেক্‌টা দেবার পর মুরারি ঘোষ সম্বন্ধে ওর নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব ঘৃণায় পর্যবসিত হ'ল। মাত্র দুমিনিটের ব্যবধান। চেক্‌টা দেবার আগে পর্যন্ত মুরারি ঘোষকে ও ঘৃণা করে নি। হয়তো বা কিছুটা করুণার চোখে দেখেছিল।

সুনীলেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল, অধ্যাপক, আমি তো আপনাকে বলেছি, আমার কোনও পারিশ্রমিকের প্রয়োজন নেই।

কথাটা বলে সুনীলেশ হাঁপাতে লাগল। একটা প্রবন্ধের জন্যে অধ্যাপক মুরারি ঘোষ যা দিতে চাইছেন তা ওর তিন মাসের মাইনের চাইতেও বেশি। এত টাকা! তাহলে মুরারি ঘোষ নিজে কতটাকা রোজগার করছেন কে জানে!

নূতন দিগন্তের সম্পাদক তবুও নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, এ-যাত্রাটা আমাকে বাঁচিয়ে দিন সুনীলেশবাবু। প্রয়োজন হলে আপনি চেকটাতে আরও বেশি টাকা লিখে নিতে পারেন।

সুনীলেশের মনের অবস্থাটা তখন একটু অন্য রকমের। কোনও রকমে মুরারি ঘোষকে বিদায় করে দিতে পারলে সে বাঁচে। শেষ পর্যন্ত একটা প্রবন্ধ লিখতে রাজী হ'লো। সরকারী এবং বে-সরকারী শিল্পোদ্যমের পক্ষে এবং বিপক্ষে যত কিছু বলবার আছে সবই প্রবন্ধে থাকবে, যেমন করে ইস্কুল-কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় লেখে। লেখকের নিজের কোনও মতামত থাকবে না। সুনীলেশ এ-কথাও স্পষ্ট করে অধ্যাপক মুরারি ঘোষকে জানিয়ে দিল যে এ-রকম লেখা ওর এই প্রথম এবং শেষ।

কাগজের রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষ পাঠক মহলে যে-খ্যাতি লাভ করেছে, তা পরিসংখ্যান কিংবা অর্থনৈতিক তারিখগুলোর নির্ভুলতার জন্যে নয়— তার বিশেষ ধরনের নিজস্ব বক্তব্যের জন্যে। এই প্রথমবার ও ওর স্বকীয় মতামত ছাড়া একটা প্রবন্ধ লিখতে রাজী হ'ল।

মুরারি ঘোষ সুনীলেশের এই প্রস্তাবকে মন্দের ভালো বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর পক্ষে কোনও উপায় ছিল না। তিনি সুনীলেশের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বেদনা বহন করে নিয়ে গেলেন— সুনীলেশ বিনা পারিশ্রমিকে প্রবন্ধ লিখতে রাজি হয়েছে। এই বেদনার মধ্যে বৃশ্চিকদংশনও ছিল। সুনীলেশ ঘোষ সেই জাতের লেখক যাদের অর্থের লোভ দেখিয়ে দলে টানা যায় না। মুরারি ঘোষের পক্ষে এটা কম বড়ো পরাজয় নয়।

সেদিন ছিল একটা ছুটির দিন। বিনয় সেন বিকেলের দিকে সুনীলেশের বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল। ওকে সঙ্গে নিয়ে সুধেন্দু-

বাবুর বাড়িতে যাবার প্রোগ্রাম আগের দিনই সুনীলেশ স্থির করে ফেলেছিল।

ওরা দুজনে যখন সুধেন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল শুরু হয়েছে। শ্যামবাজারের কাছে এক এঁদো গলিতে সুধেন্দুবাবু থাকেন। এ গলি নাম-না-জানা— নামহারা সব লোকেরা এখানে থাকেন। বর্ষায়, বসন্তে, শীতে, গ্রীষ্মে এখানে কোনও তফাত নেই। এখানকার বাসিন্দাদের জীবনে শুধু দিন গড়িয়ে রাত্রি আসে। আরও হয়তো অনেক কিছু হয়—চাকরি থাকে না, বাড়িওয়ালা কোর্টের পেয়াদা ডেকে এনে ভাড়াটে তুলে দেয়, পানীয় জলের জন্যে সকাল বিকাল মারপিট হয়। উলঙ্গ ছেলেরা রাস্তায় খেলা করে— বলতে গেলে গলির রাস্তায়ই তাদের বাস— শুধু রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার জন্যে একটা ছাউনির তলায় যায়।

কড়া নাড়তেই সুধেন্দুবাবু এসে দরজা খুলে দিলেন। আলো-বাতাসহীন একটা ছোট্ট ঘর। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল বাড়ি হবার পরে আর কখনও চুনকাম হয় নি। ঘরের ভেতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। ঘরের মধ্যে এককোণে একটা তক্তপোষ। তার ওপরে ছেঁড়া মাদুর পাতা। আর এককোণে একটা কেরোসিন কাঠের তৈরি বই-এর সেল্‌ফ্‌। কতকগুলো পুরনো ছেঁড়া বই সেটাকে অধিকার করে আছে। দেওয়ালে গুটিকয়েক ছবি টাঙানো। প্রায় গুলোই দেখে বোঝা যায় না কিসের ছবি। মাঝখানে একখানা দেবীর মূর্তি। অনেকদিন আগে তাতে মালা পরানো হয়েছিল। ফুলের পাঁপড়িগুলো সব শুকিয়ে গেছে। 'তোমরা এসেছ ভাই!' বলে সুধেন্দুবাবু অভ্যর্থনা করে ওদের নিয়ে ঘরে বসালেন।

সুধেন্দু আজ বৃদ্ধ হয়েছেন। স্বদেশী আমলের রাজনীতিতে তাঁর দাম বড় কম ছিল না। পুরনো দিনের লোক। নীতি মেনে চলেন। পান থেকে চুন খসবার উপায়টি নেই। ওঁর তিনমেয়ে, দুই ছেলে।

ছেলেমেয়েদের সেই পুরনো কায়দায় মানুষ করেছেন; মানবিক বিচারবুদ্ধি শিখিয়েছেন, আত্মত্যাগ করতে শিখিয়েছেন, ভদ্রতা এবং বিনয় শিখিয়েছেন।

সুধেন্দু নিজেও ঠিক এই জিনিসগুলো বরাবর ভালোবেসে এসেছেন। যেখানেই নীতির সঙ্গে কাজের দ্বন্দ্ব বেধেছে, সেইখানেই তিনি নীতিকে আগলে ধরেছেন। এর জন্যে সারা জীবন তাঁকে প্রচুর দুঃখভোগ করতে হয়েছে। পেয়েছেন দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা। ছেলেমেয়েদের অর্থাভাবে মানুষ করতে পারেন নি।

শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে এই বৃদ্ধ বয়সে চাকরিটা ছেড়ে দিতে তিনি একবারও চিন্তা করেন নি, ভাবেন নি চাকরি যাবার পরের মাস থেকে সংসার চলবে কেমন করে।

সুধেন্দুবাবুর সঙ্গে বিনয় এবং সুনীলেশ, কেউই ভালো করে কথা বলতে পারছিল না। ওদের কেবলই মনে হচ্ছিল যে ওদেরই জন্যে বৃদ্ধ সুধেন্দুর চাকরিটা গেছে। সুধেন্দু কিন্তু নির্বিকার। ওদের বসতে বলেই একবার বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। সুনীলেশ বুঝতে পাবল, ওদের চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে জোড় আসন হয়ে মাতুরের ওপর বসলেন।

সুনীলেশ বলল, সুধেন্দুদা, আপনি হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলেন?

সুধেন্দু বললেন, উপায় ছিল না সুনীলেশ। ওরকম উদ্ধত মালিকের অধীনে চাকরি করা আমি মনুষ্যত্বের অবমাননা বলে মনে করি।

বিনয় বলল, তাহলেও এতবড়ো সংসার ঘাড়ে। একটু ভেবে চিন্তে চাকরিটা ছাড়লেই ভালো হত।

এইবার সুধেন্দু ভয়ানক চটে গেলেন। বললেন, তোমার কোনও অতি আপনজন যদি তোমাকে এমন করে অপমান করত, তাহলে তুমি তাকে ক্ষমা করতে? মনে রেখো, শচীন্দ্রনাথের পিতা এবং আমি দুজনে মিলে কাগজটাকে দাঁড় করিয়েছিলাম। আজ শচীন্দ্র

নাথের কাগজের যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, পঁচিশ বছর আগে তা ছিল না। আমি আর অমৃতেন্দ্রনাথ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি বিজ্ঞাপনের জন্যে। দুজনে ছোলা ভাজা খেয়ে রাস্তায় টিফিন করেছি। অমৃতেন্দ্রনাথ আমাকে কর্মচারীর মতো কখনো দেখেন নি। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে আমিও কাগজের একজন অংশীদার। সেই কাগজের আপিসে বসে শচীন্দ্রনাথের এই অপমান কোনো ভদ্রলোক সহ্য করতে পারে? আমি পারি না।

সুনীলেশ বলল, সবই বুঝি সুধেন্দুদা। কিন্তু সংসার জায়গাটা বড়ো কঠিন স্থান। এখানে অনেক সময় নীতির সঙ্গে আপোষ করতে হয়।

—আমি করি নি কখনও. করবও না। ছেলেমেয়েদের বলে দিয়েছি, সকাল বিকেল ছোলা সেদ্ধ, আর আঁখি গুড়। একবেলা ডাল ভাত; অন্যবেলা যা জোটে তাই। তারপর একটুখানি থেমে আস্তে বললেন, ওরা কিন্তু তাতে মনক্ষুণ্ণ হয় নি। বাপকে চেনে কিনা।

একটি ছিপছিপে কালোরঙের মেয়ে তিন কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সুধেন্দু বললেন, এই আমার বড়ো মেয়ে কুন্তী। বড়ো ভাল মেয়ে। দিনরাত সংসারের কাজকর্ম করে। ওর মায়ের শরীর ভাল নয়। বাকী সময়টা পূজোপার্বন করে কাটায়। এমন মেয়ে আজকাল বড়ো-একটা দেখা যায় না।

পিতার প্রশংসায় কুণ্ঠিতা হয়ে চায়ের কাপগুলি রেখেই কুন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুনীলেশ কুন্তীকে দেখে ভাবতে লাগল, যুধিষ্ঠিরের মা ছিলেন কুন্তী; সুধেন্দুদার মেয়ের নামও কুন্তী। একজন রাজমাতা আর একজন দরিদ্রতম সাংবাদিক সুধেন্দু পালের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

হয়তো যখন কুন্তী জন্মেছিল তখন অনেকে ওকে আশীর্বাদ করে-ছিলেন 'রাজরানী হও'।

আশীর্বাদ কুড়িয়ে কুন্তী এত বড়ো হয়েছে। সমাজের কাছে, সংসারের কাছে, এমন কি হয়তো পিতা সুধেন্দুবাবুর কাছেও আজ সে অনাকাঙ্খিতা। কুন্তী না জন্মালেই বা সুধেন্দুবাবুর কি আসত যেত?

কুন্তীর বয়স সাতাশ-আঠাশ বছরের কম নয়। সুধেন্দুর প্রথম সন্তান হ'লে তাই হয়। পিঠটা ঈষৎ কুঁজো হয়ে গেছে। বয়সে নয়—অপমানে, লজ্জায় এবং জীবনের হতাশার চাপে। চোখদুটো কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। নিরাভরণ হাত। গলায় এক দানা সোনা নেই। শাড়ী আর ব্লাউজে পিতার অসামর্থ্যের স্পষ্ট ছাপ। কয়েকগাছি অসম্বৃত চুল কুন্তীর কপাল আর চোখের উপর এসে পড়েছিল। সুনীলেশ স্পষ্ট দেখতে পেল, কুন্তীর চোখে মুখে শত লক্ষ কুণ্ঠার ছাপ।

মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন নি বলে সুধেন্দুবাবুর জ্বালা যে বড়ো কম ছিল তা নয়। নিজেকে তিনি সব সময়ে অপরাধী বলে মনে করতেন। হয়তো বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরে বন্ধুদের কাছে মেয়ের এই প্রশংসা সেই অপরাধী মনের একটি অভিব্যক্তি মাত্র।

সুধেন্দুবাবু বললেন, অনেক আশা ছিল কুন্তীকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাব, সৎপাত্রে পাত্রস্থ করব। কিন্তু হল না। ও ছোটো-বেলায় লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। কিন্তু ওর মায়ের অসুস্থতার জন্যে ওর পড়াশুনো হল না। যা মাইনে পেতাম, তা অসুস্থা গিন্নির চিকিৎসার জন্যেই খরচ হয়ে যেত। আই. এ. পরীক্ষার ঠিক আগে কুন্তীকে লেখাপড়া ইস্তফা দিতে হল। মেয়েও আমার খুব ভালো। রুগ্না মায়ের সেবা আর ছোটো ভাইবোনদের দেখাশুনো করবার সমস্ত দায়িত্বই ও কাঁধে তুলে নিল। তখন ওর বয়েস আঠারো কি উনিশ। ওর মা এখনও বলেন, কুন্তী না থাকলে তাঁর জীবন রক্ষা হত না। ভাইবোনরা সব দিদি বলতে অজ্ঞান।

বিয়ে দেবার চেষ্টা সুধেন্দুবাবু যে করেন নি, এমন নয়। কুন্তী সুন্দরী নয়। বাঙালীর মেয়ে, রঙ ময়লা, তার ওপরে পিতার

নিদেন পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করবার ক্ষমতা নেই। বিয়ে হওয়া সত্যি অসম্ভব। দু-চারটে সম্বন্ধ এসেছিল। অতি সাধারণ ছেলে— দেড়শো থেকে দুশো টাকা মাইনে পায়। তাদেরও দাবি এক হাজার টাকা নগদ, অন্ততঃ দশভরি সোনা, ফার্নিচার, একটা ঘড়ি এবং এক সেট্ সোনার বোতাম। অনেকের আবার রেডিও সেট্ও চাই।

এক ডাক্তারের সঙ্গে কুন্তীর বিয়ের কথা হয়েছিল। ছেলের বাবা বলে পাঠালেন, তাঁদের দাবি-দাওয়া কিছুই নেই। মেয়ের বাবা নিজের মেয়েকে যা দিতে চান দেবেন। তবে ছেলে এম-বি-বি-এস পাস করেছে, হাজার দশেক টাকা দিয়ে একটা ডিস্পেনসারি করে দিতে হবে।

আরও অনেক বিয়ে ভাঙার কাহিনী সুধেন্দুবাবু শোনালেন। কুন্তীর কথা বলতে বলতে সুধেন্দু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। ওদের চা খাওয়া হয়ে গেলে সুধেন্দুবাবু বললেন, সুনীলেশ, আমি বস্তীতে থাকি না, এই আমার অপরাধ। আমার অপরাধ আমি ভদ্রলোক। আমার আত্মীয়-স্বজনরা অবস্থাপন্ন, সবাই ভালো ভালো চাকরি করেন। যদি সমাজের আর একধাপ নীচের মানুষ হতাম তাহলে কুন্তীর বিয়ে দিতে পারতাম।

একটুখানি দম নেবার জন্যে সুধেন্দু শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, কুন্তী পূজোআর্চা নিয়ে থাকে, রাস্তায় বেরোয় না, সিনেমা দেখে না, বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে, শ্রীমার উপদেশামৃত মুখস্ত করে। কিন্তু বাপ হয়ে আমার কর্তব্য পালন করতে পারলাম কই? এইবার সুধেন্দুর চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল চিক্ চিক্ করে উঠল। বললেন, আরও দু-মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। ওদেরও পড়াশুনো বেশি দূর পর্যন্ত হয় নি। একজন ক্লাস সিক্স আর একজন ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়েছে। কারণ একই। আমার

অর্থাভাব। ছেলে দুটো ছোট, ওরা বড়ো হয়ে চাকরি-বাকরি করে দিদিদের বিয়ে হয়তো দিতে পারত, কিন্তু ততদিনে ওদের আর ঘিয়ের বয়স হয়তো থাকবে না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুধেন্দু নিদারুণ হতাশার সুরে বললেন, তার পরে ধরো, আমি মরে গেলাম। আমার আর কদিন? ছেলেরা বড়ো হয়ে বিয়ে থা করল। তখন কুন্তী, দময়ন্তী, আর সীতা তিন বোনকে ভাইদের সংসারে জীবন কাটাতে হবে। ভায়ের স্ত্রীরা যদি ওদের গ্রহণ করেন, তা হলেই রক্ষে, নইলে ওদের ক্রীতদাসীর পর্যায়ে নামতে হবে। আমাদের সমাজের মেয়েদের এই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সুনীলেশ আর বিনয় সেন সুধেন্দুকে সান্ত্বনা দিল, আশার বাণী শোনাল।

এও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে আশা নেই, সেখানেও আশার বাণী শোনাতে হয়; মৃত্যু যেখানে পরম প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেখানেও বলতে হয়, মৃত্যু তো স্বাভাবিক জিনিস; সকলকেই একদিন মরতে হবে। যাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, সেও জানে এটা নিছক সান্ত্বনা। যে সান্ত্বনা দেয় সেও জানে নিছক সান্ত্বনা, এ সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই সুনীলেশ আর বিনয়ের আশার বাণী সুধেন্দুর কাছে অর্থহীন বলে মনে হ'লো। ওরা বুঝতে পারছিল, কুন্তী দময়ন্তী আর সীতার কোনোদিনও বিয়ে হবে না।

সুধেন্দুর বাড়ি থেকে ফিরবার সময় সুনীলেশ বিনয় সেনকে বলল, সুধেন্দুদা আদর্শবাদী। চিরকাল আদর্শবাদীদের এমনি করে পড়ে মার খেতে হয়। সুবিধেবাদীরা আদর্শের আড়াল থেকে লাভবান হয়। কুন্তীকে দেখে বড্ড খারাপ লাগল। কুন্তী বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ অনূঢ়া মেয়েদের প্রতীক। কুন্তীকে দেখলাম, অন্যদের দেখি নি। দেখবার প্রয়োজনও নেই।

বিনয় সেন বলল, আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একই সমস্যা।

বক্তৃতা দিয়ে আর প্রবন্ধ লিখে এর সমাধান সম্ভব নয়। সমস্ত সমাজটাকে ভেঙেচুরে একেবারে উপড়ে ফেলে দিতে পারলে যদি কিছু হয়।

অসময়ে ঝড় উঠেছে। কালবৈশাখীর এখনও অনেক দেরি। সুনীলেশ বাড়ি ঢোকবার একটু আগে ঝড়ের মুখে পড়ল। যখন বাড়ি গিয়ে পৌছল, তখন ওর সারা শরীর ধূলোয় ভর্তি। মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাকড়শার জাল দিয়ে ঢাকা। চোখদুটো বুজে আসছিল। নাকে কালবৈশাখীর গন্ধ। ভালোও লাগে। কচি পাতা, ঘাস আর মাটির গন্ধ। দৌড়ে ঘরে ঢুকতেই সুনীলেশের কানে এল নারীকণ্ঠের উচ্চকিত হাসি।

সুনীলেশের চোখ তখনও অর্ধমুদিত। বুঝতে পারল মাধবী বিদ্যাধরকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছে। বিদ্যাধরের বয়েস হয়েছে। অত তাড়াতাড়ি দুটো ঘরের দশটা জানালা বন্ধ করতে পারবে না। তাই মাধবী এসেছে। ও ঘরে ঢুকতেই মাধবী বলল, আপনার এ কী দশা সুনীলেশদা? আপনি কিরকম লোক বুঝতে পারি না। ঝড়ের মুখে লোক কখনও রাস্তা দিয়ে হাঁটে? কোথাও একটু দাঁড়ালেও তো পারতেন!

সুনীলেশের তখন কথা বলবার অবস্থা নেই। কোনও রকমে চশমাটা খুলে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। স্নান করে বেরিয়ে এসে দেখে মাধবী তখনও যায় নি। রান্না ঘরে বিদ্যাধরকে খাবার তৈরি করতে সাহায্য করছে।

খাবার নিয়ে বিদ্যাধর এল। পেছনে এল মাধবী। সুনীলেশকে উদ্দেশ করে বলল, সত্যিই সুনীলেশদা, আপনি বড়ো অদ্ভুত! আমি এখানে না থাকলে, অমলেটটা বিদ্যাধরদা একেবারেই পুড়িয়ে ফেলত। এ-সব কি ওর কাজ? আপনি যে কি ছাইপাশ খান বুঝি না বাপু!

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুচকি হেসে আবার বলল, আপনি খুব পণ্ডিত বলে মামার কাছে শুনেছি। আপনার খুব নাম। সবাই আপনাকে চেনে। কিন্তু আপনার বুদ্ধি বড়ো কম!

সুনীলেশ তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, কি বললে মাধবী?

—তা নয় তো কি, নইলে টাকাপয়সা রোজগার করে মানুষ অমন ছাইপাঁশ খায়, আর অমন অগোছাল ঘরে বাস করে?

সুনীলেশ বলল, আমার মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হলে তোমাকেও এই অবস্থায় থাকতে হত।

—আমি হলে, মাধবী গম্ভীর ভাবে বলল, সুন্দর করে ঘর সাজাতাম, আরামসে থাকতাম।

—আমিও তো বেশ আরামসেই আছি, মাধবী! খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি—মন্দ কি?

—একে যদি আরামে থাকা বলে, তাহলে কষ্টে থাকা কাকে বলে জানি না।

সুনীলেশ হাসতে হাসতে বলল, তুমি বিয়ে করলেই তো পারতে মাধবী! কর নি কেন? ঘর সাজাতে, ফুলের টব দিয়ে বারান্দা সাজাতে, আনন্দে থাকতে!

মাধবীর মুখটা ভারী হয়ে এল। হঠাৎ বোঁ করে সুনীলেশের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে উলটো দিকের জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, ওকথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন! মামাকে জিজ্ঞেস করবেন। আরও একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখুন সুনীলেশদা, কোনও মেয়েকে ওকথা জিজ্ঞেস করবেন না।

সুনীলেশ বুঝতে পারল, না জেনে ও মাধবীর একটা দুর্বল স্থানে আঘাত করেছে। একথাটা বলা উচিত হয় নি! হয়তো বা কোনো মেয়েকেই এরকম কথা বলা উচিত নয়, মাধবীকে তো নয়ই। ওর মা বাবা নেই, মামার গলগ্রহ হয়ে রয়েছে।

সুনীলেশের মনে দুঃখ হল। যা বলা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা যায় না— কিন্তু তবুও যদি কিছু বলে মাধবীর বেদনাহত মনকে একটুখানি সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তাই ও বলল, তোমার মামা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই করবেন— তুমি ভেবো না। আমার সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে।

মাধবী এইবার না হেসে পারল না। সে-হাসি আনন্দের না বেদনার তা বলা মুশকিল। একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, মামা চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু ফল কিছুই হবে না।

সুনীলেশ বলল, কেন হবে না! নিশ্চয়ই হবে। মেয়েদের কি আর বিয়ে হয় না?

মাধবী আবার হেসে বলল, দেখবেন যা বললাম তা ঠিক কি না!

মাধবী চলে যাবার পর সুনীলেশের মনে দুটো মেয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। সুধেন্দুদার মেয়ে কুন্তী আর এক মামার অনূঢ়া ভগ্নীকন্যা মাধবী। বিয়ে দেবার ক্ষমতা সুধেন্দুদারও নেই, মামারও নেই। কিন্তু বিয়ের বাজারে মাধবীর দাম বেশি, কারণ ও সুন্দরী। কুন্তীকে অনেকবার বিয়ের বাজারে নিলাম করার জন্যে তোলা হয়েছিল, কিন্তু ডেকে নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় নি। ভাঙা ফার্নিচারের মতো বিনে পয়সায় দিলেও কেউ নিতে চায় নি। মাধবীর ডাক এখনো হয় নি। হলে হয়তো বা ক্রেতা পাওয়া যেতে পারে। মাধবী সুন্দরী। ব্যর্থতা এবং গ্লানির ভারে এখনও ওর দেহ কুন্তীর মত বেঁকে যায় নি। কুন্তীর জীবনে যৌবনের ভাঁটা, মাধবীর জীবনে যৌবনের জোয়ার।

ওর চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়ে হঠাৎ বিদ্যাধর ঘরে ঢুকে বলল, দাদাবাবু, মাধবীদির মামা আপনার সঙ্গে কাল সকালে একবার দেখা করতে চান। কাল তো আপনার দুপুরে আপিস।

সুনীলেশ বলল, বেশতো, বেশতো, মাধবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে— ওর মামার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাও তো দরকার।

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ সত্যিই মাধবীর মামা স্নুনীলেশের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হলেন। স্নুনীলেশ তখন কেবল ঘুম থেকে উঠেছে। বিদ্যাধর পরিচয় করিয়ে দিল।

মাধবীর মামা বললেন, স্নুনীলেশবাবু, আমিই হরিভূষণ চক্রবর্তী, মাধবীর মামা।

স্নুনীলেশ নমস্কার বিনিময় করে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম। বিদ্যাধর কালকে বলছিল, আপনি আজ আসবেন।

হরিভূষণবাবু বাংলাদেশের যে কোনও দরিদ্র মামার একজন। ছটি পুত্রকন্যা, তার ওপর স্বর্গতা বিধবা ভগ্নীর কন্যার দায়িত্ব। মাইনে সবসাকুল্যে দুশো টাকার বেশি নয়। দারিদ্র্য আঘাত করতে করতে ওঁকে প্রায় সম্বিৎহীন করে এনেছে। হরিভূষণ-বাবুকে দেখলেই মনে হয়, জীবন ওঁর কাছে অর্থহীন। বাঁচতে হয়, তাই বেঁচে আছেন। নিজের জন্যে বাঁচবার কোনও প্রয়োজন নেই, তাগিদও কিছু নেই।

দু-একটা কথা বিনিময়ের পরই হরিভূষণবাবু বললেন, মাধবীর কাছে আপনার কথা প্রায়ই শুনি। অবশ্য যারা খবরের কাগজ পড়ে, তারা সবাই আপনাকে জানে। কিন্তু আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি ; তাই একবার এলাম।

স্নুনীলেশ মুচকি হেসে বলল, দেখতেই পাচ্ছেন হরিভূষণবাবু, স্নুনীলেশ ঘোষের দু-হাত, দু-পা, দুটো চোখ রয়েছে। আপনাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ।

হরিভূষণবাবু বললেন, মানুষ তো দেখতে সব একই রকম, কিন্তু তা হলেও মানুষে মানুষে তফাত অনেক। এই তো দেখুন না, দু-হাত, দু-পাওয়ালা হরিভূষণ চক্রবর্তী আপনার সামনে বসে রয়েছে— দেখতে মানুষ, কিন্তু জীবনে মানুষের মতো কোন্ কাজটাই বা করতে পেরেছে ? না পারলাম নিজের ছেলেপুলে মানুষ করতে,

না পারলাম মাধবীটার একটা বিয়ে দিতে।···বিয়ের কথাবার্তা যে দু-একবার হয় নি তা নয়; কিন্তু বুঝতেই পারেন, সবই টাকা পয়সার ব্যাপার। আমার মাধবী সুন্দরী; তা হলেও আজকের দিনের রাজপুত্তুরদের পক্ষীরাজ কিনে দিলে তবে উড়ে আসতে পারে।

সুনীলেশ একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, মুশকিল কি জানেন, আজকাল ছেলেরা সহজে বিয়ে করতে চায় না।

হরিভূষণবাবু বললেন, বেশ করে, সুনীলেশবাবু। দেশের যা অবস্থা, তাতে ছেলেরা যে বিয়ে করতে চায় না এটা খুব ভালো কথা। আর কিছু হ'ক না হ'ক, ছেলেগুলোর বুদ্ধি আছে বলতে হয়। আমাদের মতো বুদ্ধু নয়। দেখুন না, বিশ বছর বয়সে বিয়ে করে আজ কেমন ন্যাজেগোবরে হয়ে পড়েছি।

তারপরে দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কথা হ'ল। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, মায় ক্রুশ্চেভ পর্যন্ত। ঘণ্টা-দুই পরে হরিভূষণবাবু বিদায় নিলেন।

হরিভূষণবাবু চলে যাবার পর সুনীলেশ নিজেকে চিন্তার স্রোতে ভাসিয়ে দিল।

মাধবী সুন্দরী। তবুও ওর বিয়ে হচ্ছে না। হরিভূষণবাবু হয়তো বিয়ের সম্বন্ধ দেখে দেখে এরই মধ্যে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। মাধবী আরো একটু কম সুন্দরী হলেও বিয়ে এতদিন হয়ে যেত— শুধু যদি ওর মামার কয়েক হাজার টাকা খরচ করবার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু যাঁদের টাকাও নেই, মেয়েও সুন্দরী নয়, তাঁরা কি করবেন?

আবার একদিন শচীন্দ্রনাথের ঘরে সুনীলেশের তলব পড়ল। সুধেন্দুবাবুর পদত্যাগের পর শচীন্দ্রনাথ এই প্রথম ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

তখন রাত্রি আটটা হবে। সুনীলেশ শচীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এবার শচীন্দ্রনাথ যেন একটু গম্ভীর। ঘরে যেতেই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বসো।

সুনীলেশ প্রথমে কথা বলল না। শচীন্দ্রনাথকেই নীরবতা ভঙ্গ করতে হ'ল। তিনি বললেন, সুনীলেশ, সুধেন্দুবাবুর খোঁজ আর কিছু রাখ ?

ও বলল, হ্যাঁ স্যার, রাখি বই কি ?

—কোথাও কাজে লেগেছেন কি ?

—আজ্ঞে না স্যার।

—তাহলে ওঁর চলছে কি করে ?

—তা জানি না, তবে ছেলেমেয়েরা ছোলাসেদ্ধ আর আখিগুড় খাচ্ছে, এইটুকু জানি।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, আমি ভাবছি ওঁকে আবার কাজে লাগতে বলব।

সুনীলেশ চুপ করে রইল।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, অবশ্য সাব-এডিটরের আর এখন প্রয়োজন নেই ; তবে বিজ্ঞাপন বিভাগে ওঁর জন্যে একটা চাকরি করে দেব, স্থির করেছি। তুমি ওঁকে একটা খবর দিও, আমার সঙ্গে যেন দেখা করেন।

সুনীলেশ বলল, খবর দিতে পারি, তবে বোধ হয় তিনি আসবেন না। আর তা ছাড়া একজন সিনিয়র সাব-এডিটরকে বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করতে বলাটাও······

শচীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মনে তখন দুটো স্রোতের ধারা বইছে। এক দিকে বাবার আমলের কর্মীকে অমনভাবে বিদায় দেওয়ার দরুন খানিকটা অস্বস্তিবোধ আর অন্যদিকে অনবদমিত এক দরিদ্র বৃদ্ধকে নিজের খেয়াল খুশিমত চালাতে না পারার ব্যর্থতা। পুরনো পোস্টে সুধেন্দুবাবুকে বহাল করা অসম্ভব। সে-পরাজয়

শচীন্দ্রনাথ মালিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। আবার নিজের বাড়িতেও কথা উঠেছে বৃদ্ধ সুধেন্দু পালকে অমন করে চলে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি।

শচীন্দ্রনাথ সুনীলেশের মধ্যস্থতায় সুধেন্দুর সঙ্গে একটা আপোস করতে চাইছিলেন। মাইনে একই রেখে যদি বিজ্ঞাপনের ডিপার্টমেন্টে কপি রাইটারের একটা পোস্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙে না। কিন্তু সুনীলেশ বড়ো একটা গা করল না দেখে তিনি একটুখানি মুষড়ে পড়লেন।

সুনীলেশ বলল, আপনি যদি সুধেন্দুবাবুকে ফিরিয়ে আনতে চান, তাহলে ওঁকে একটা চিঠি লিখুন। আমার কথায় হয়তো আসবেন না।

শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন সুনীলেশ দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। তাই তিনি আর ও কথা নিয়ে পীড়াপীড়ি করলেন না। এবার এলেন অন্য কথায়।

—আরও একটা জরুরি কথা ছিল তোমার সঙ্গে, বলে শচীন্দ্রনাথ সুনীলেশের কাছে অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, এখন থেকে তুমি সপ্তাহে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর অন্তত দুটো করে লেখা লিখবে। আমি বার্তা-সম্পাদককে বলে দিয়েছি।

সুনীলেশ বুঝতে পারল এটা শচীন্দ্রনাথের একটা নতুন চাল। সুধেন্দুবাবুর পদত্যাগের পর কাগজের আপিসে যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়েছে, সেই অবস্থাটাকে তিনি হালকা করে দিতে চাইছেন। সুনীলেশ পালের গোদা— ওকে যদি কোনও রকম করে হাত করে ফেলা যায়, তা হলে সমস্যাটার হয়তো অন্তত আংশিক সমাধান সম্ভব হবে।

কিন্তু হলে কি হয়, শচীন্দ্রনাথ সুনীলেশের চিন্তাধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দেশে কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হলে সুনীলেশের প্রবন্ধ কাজে লাগে। আরও দৈনিক কাগজ আছে। এক-একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একে অন্যকে পরাজিত

করবার চেষ্টা করে। দাঙ্গা নিয়ে লিখে একবার শচীন্দ্রনাথের কাগজের সার্কুলেসন প্রায় দশ হাজার বেড়ে গিয়েছিল। অন্য এক প্রতিযোগী সম্প্রতি ভারতভূমিতে এক বিদেশী রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের গুহ্য তথ্য পরিবেশন করে শচীন্দ্রনাথকে চিন্তায় ফেলেছেন।

মাঝে মাঝে দৈনিক কাগজের স্তম্ভে আগুন ছড়াতে হয়। জনসাধারণ যে সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে জনপ্রিয় লেখার প্রয়োজন আছে। সুনীলেশের মতন অগ্নিবর্ষী লেখনী আর কারুরও নেই। তাই শুধু ব্যবসার খাতিরে শচীন্দ্রনাথ সুনীলেশের ওপর দায়িত্বটা চাপিয়ে দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটার অসঙ্গতি কয়েকদিনের মধ্যেই সুনীলেশের চোখে ধরা পড়ল। হঠাৎ সম্পাদক একদিন সন্ধ্যায় সুনীলেশকে জানালেন যে পরের দিনের লেখাটা ওকে লিখতে হবে না। ওটা লিখবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাব-এডিটর অমরেন্দ্র দাশগুপ্তকে।

সুনীলেশের বুঝতে এতটুকুও দেরি হল না। একটা ধর্মঘট চলেছে। কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। সেগুলোকে ফলাও করে লিখলে শচীন্দ্রনাথের কাগজের অন্য দিক থেকে ক্ষতি হতে পারে। তাই ঠিক সময়মত তিনি আদেশ পাঠিয়েছেন, লেখাটা যেন সুনীলেশ না লিখে অন্য কেউ লেখেন।

কিন্তু গোলমাল হল পরের দিন। প্রতিযোগী দৈনিক কাগজে দু-কলাম লেখা বেরুল ধর্মঘটীদের পক্ষ নিয়ে। সঙ্গে অনেকগুলো ফোটো। বেলা দশটা নাগাদ শচীন্দ্রনাথ তাঁর কাগজের প্রধান পরিবেশকের কাছে টেলিফোন করে জানলেন, কাগজের বিক্রি পড়ে গেছে। প্রতিযোগী কাগজ হকারদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তায় লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কাগজ কেনার জন্যে। যাঁরা নিয়মিত শচীন্দ্রনাথের কাগজ পড়েন, তাদের কাছ থেকে সম্পাদকের আপিসে টেলিফোন আসতে লাগল— এ কি ব্যাপার!

এমন একটা ঘটনা স্রেফ্ চেপে যাওয়া হয়েছে! পেছনের দিকে একটা দায়সারা কলাম ছাড়া কিছু লেখা হয় নি!

শচীন্দ্রনাথকে প্রায়ই এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এক দিকে ভালো বিজ্ঞাপনের লোভ, অন্য দিকে জনমতের চাপ। এক দিকে অর্থ, অন্য দিকে ভালো সাংবাদিকতা। কোনোটাকেই উপেক্ষা করা যায় না।

তিনি সন্ধ্যাবেলা সুনীলেশকে আবার ডেকে পাঠালেন। সুনীলেশ কিন্তু বুঝতে পেরেছিল, পরের দিন ধর্মঘটের পক্ষে সাফাই গেয়ে ওকে একটা-কিছু লিখতে হবে। নতুন নতুন উদ্ঘাটিত তথ্যগুলি পরিবেশন করতে হবে।

শচীন্দ্রনাথের ঘরে যেতেই তিনি বললেন, সুনীলেশ, কাল একখানা ভালো close-up চাই। এমন-কিছু একটা চাই, যাতে আজকের লোকসান পুষিয়ে নিতে পারি। তবে একটা কথা মনে রেখো। কালকে অমরেন্দ্র যা লিখেছিল, সেটাকে কোনও কোনও তথ্যাভিজ্ঞমহলের মত বলে চালিয়ে দিও। ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলে অত্যন্ত হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

সুনীলেশের বলবার কিছুই ছিল না। নিঃশব্দে শচীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে রিপোর্টারদের ঘরে এসে বসল।

শচীন্দ্রনাথ কিন্তু সুধেন্দু পালকে চিঠি লিখলেন। আপিসি চিঠি। তিনি এসে অবিলম্বে বিজ্ঞাপনের ডিপার্টমেন্টে কপি রাইটারের পদে যোগদান করতে পারেন। মাইনেতে কোনও হেরফের হবে না।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কথাটার তাৎপর্য সুধেন্দুবাবু এইবার বুঝতে পারলেন। মালিক শচীন্দ্রনাথের ঔদ্ধত্য সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অন্তত সুধেন্দুবাবুর কাছে তাই মনে হল। চিঠি

পাবার পরই তিনি সুনীলেশকে ফোন করে জানালেন এবং একবার ওঁর ওখানে যেতে বললেন।

ইতিমধ্যে সুধেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করা সুনীলেশ একটা কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিল, অন্তত যতদিন ওঁর একটা কিছু না হয়। সেদিন মাইনে পাবার পর ওঁকে ত্রিশটি টাকা দিয়ে এসেছে। ত্রিশ টাকা সুধেন্দুবাবুর প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু সুনীলেশের কাছে বড়ো কম কথা নয়। পিসিমাকে দেড়শো টাকা দিয়ে, ওর হাতে ক টাকাই বা থাকে? এর পর বাড়িভাড়া আছে। বিদ্যাধরের মাইনে আছে। কিন্তু নিজের অসুবিধার কথা চিন্তা করবার মতো মনের অবস্থা সুনীলেশের তখন ছিল না। সুধেন্দুবাবু সপরিবার অনশন করবেন, এটা চিন্তা করাও পাপ।

সুনীলেশ সুধেন্দুবাবুর বাড়ি যেতেই উনি শচীন্দ্রনাথের চিঠিখানা দেখালেন। তার পরে বললেন, কি রকম বুঝছ সুনীলেশ? এর আগেই যে শচীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিবাদ জানানো হয়ে গেছে সেকথা সুনীলেশ ওঁকে বলল।

সুধেন্দুবাবু বললেন, তুমি শচীন্দ্রনাথকে বলো— সুধেন্দুর সব কিছু ভেঙ্গে গেলেও মেরুদণ্ড ভাঙে নি এবং কখনও ভাঙবে না। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, তোমার বউদি কিন্তু বলছিলেন······

সুনীলেশ বলল, বউদির পক্ষে একথা বলা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর কাছে এখন সম্মানের চাইতেও ছেলেমেয়েদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

সুধেন্দুবাবু খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন। তারপর হঠাৎ অদ্ভুত বেদনামিশ্রিত স্বরে বললেন, কিন্তু ভাই সুনীলেশ, এ আমি কেমন করে পারি বল তো? এও কি সম্ভব? আমি মাথা নীচু করে ওই আপিসে ঢুকব কি করে?

সুনীলেশ উভয়সংকটে পড়ল। সুধেন্দুদার সাংসারিক অবস্থার

কথা ও জানে। একমাস মাইনে না পেলে নির্জলা উপবাস করতে হবে— অথচ যেখানে সম্মানের প্রশ্ন, সেখানে আপোস করবার কথা বলাই বা যায় কি করে ?

বেরিয়ে আসবার আগে সুধেন্দুবাবু ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, সুনীলেশ, তোমার দেওয়া ত্রিশ টাকা আমার যে কি উপকারে লেগেছে তা বলতে পারব না। কোনও রকম করে আধ মন চাল আর কিছু ডাল ঘরে এনে তুলেছি। তাই দু'বেলা সবারই পেটে কিছু পড়ছে। দেখো ভাই, যা করে হ'ক, কোথাও কিছু একটা জোগাড় করে দিও। নইলে কিন্তু আমি নিরুপায়।

সুনীলেশ জানত, সুধেন্দুদার পক্ষে চাকরি পাওয়া একরকম অসম্ভব। এমনিতেই ওঁর রিটায়ার করবার বয়েস হয়েছে, তার ওপরে মালিকের মুখের ওপরে জবাব দিয়ে চাকরি ছেড়েছেন। কাগজের মালিকদের মধ্যে এমনিতে প্রতিযোগিতার অন্ত নেই, প্রয়োজন বোধে খিস্তি খেউড়ও চলে, কিন্তু এক ব্যাপারে ওদের মধ্যে এক দারুণ ঐক্য রয়েছে ; সেটা হচ্ছে, এক আপিস থেকে কোনও কর্মী ছাঁটাই হলে, তাকে অন্য আপিসে না নেওয়া। এটা নিজেদের মধ্যে ওরা একটা convention করে নিয়েছে। কাজেই সুধেন্দু পাল শত চেষ্টা করলেও কোনো দৈনিক কাগজে চাকরি যে পাবে না সে-কথা শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই জন্যেই কপি রাইটারের চাকরির প্রস্তাব করেছিলেন। হয় প্রস্তাব গ্রহণ না হয় ও লাইন ছেড়ে অন্য লাইনে গমন। এর মাঝখানে আর কোনো রাস্তা নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সুধেন্দুদার এঁদো গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুনীলেশ শচীন্দ্রনাথের মনের এঁদো গলির কথা ভাবতে লাগল, যে গলিতে ভালোবাসা কিংবা সমবেদনার সূর্যালোক কখনও প্রবেশ করে না।

প্রয়োজন বোধে শচীন্দ্রনাথ সব কিছু করতে পারেন। তাঁর কাছে নিজের স্বার্থ ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই। ও মনে মনে সুধেন্দুর

মনের জোরকে প্রণাম জানাল। যে লোকটা হয়তো একজন দুর্জয় সেনাপতি হতে পারত, সে আজ শচীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়হীন ধনকুবেরের পাল্লায় পড়ে অনশনে দিন কাটাচ্ছে।

সারাদিন খেটে এসে সুনীলেশ কেবল একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করছে, এমন সময় বিদ্যাধর এক নতুন খবর পরিবেশন করল। মাধবীরা নাকি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। প্রথমে সুনীলেশ কথাটা গায়ে মাখে নি। কিন্তু বিদ্যাধর সমস্যাটার গুরুত্ব ওকে উপলব্ধি করিয়ে তবে ছাড়বে। ও বলল, মাধবীর মামা নাকি ছ-মাসের বাড়িভাড়া দিতে পারে নি, তাই তাকে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এমনিতে যদি হরিভূষণবাবু বাড়ি বদলাতেন, তাহলে হয়তো সুনীলেশের খুব বেশি কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বাড়িওয়ালা ওঁকে তুলে দিচ্ছে, এ খবরটা সত্যিই বড়ো বেদনাদায়ক।

সুনীলেশ বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মাধবীরা কোথায় যাবে! কই মাধবী একবার তো এলও না?

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ছাদের ওপরকার টবের মধ্যে যে রজনীগন্ধার চারাটা বেড়ে উঠেছিল, বর্ষার দমকা হাওয়ায় কবে যেন ভেঙে নুয়ে পড়েছে।

মাধবী কিন্তু এল। আজ মাধবীর চেহারাটা একটু অন্য রকমের। হাসি আছে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চাঁদের ওপর দিয়ে মেঘেরা পাড়ি জমালে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। আজও অন্যদিনের মতো ও এসে বারান্দার থামটার আড়ালে দাঁড়াল।

সুনীলেশ তৈরি হল মাধবীর চলে যাবার খবর শোনবার জন্যে। কিন্তু মাধবীর মুখে কোনও কথাই নেই। সুনীলেশই প্রথম কথা বলল।

—মাধবী, তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ, শুনলাম?

—কই, না তো ? মাধবী বলল।

সুনীলেশ চুপ করে রইল। ও বুঝতে পারল মাধবী মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু এ মিথ্যে আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে বলতে হয় বইকি ? মাধবীর মামা যত দরিদ্রই হ'ন না কেন, বাড়ি ভাড়ার জন্যে বাড়িওয়ালা তুলে দিয়েছে, এ খবর প্রকাশ করাটা ওঁর পক্ষে একটা চরম অপমানজনক ব্যাপার।

সুনীলেশ তাই কথার মোড় ফিরিয়ে বলল, শুনলাম, তোমরা অন্য কোথাও ভালো বাড়ি পেয়েছ ?

মাধবী বলল, মামাবাবু বলেছেন, এর চাইতে একটা ভালো বাড়ি পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া গেলে রোববার দিনই আমরা হয়তো চলে যাব।

দুজনেই চুপচাপ।

একটু পরে মাধবী আবার বলল, সুনীলেশদা, আপনার মন কেমন করবে না ?

সুনীলেশ কথা বলল না। মাধবী আবার বলল, বিদ্যাধরদার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগবে।

তবুও সুনীলেশ কথা বলল না। বলবার ছিলই বা কি ? জীবনের পথ চলতে চলতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়। যে যার পথে চলে যায়। মনে যদি কাউকে থাকেও, তাও বা কতক্ষণের জন্যে ?

মাধবী বলল, সুনীলেশদা, আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন না ?

—নিশ্চয়ই ! এবার সুনীলেশ বলল, তোমার ঠিকানাটা বিদ্যাধরের কাছে রেখে যেও।

—যাব, বলে মাধবী বেরিয়ে গেল।

মাধবী চলে যেতেই বিদ্যাধর সুনীলেশের কাছে এসে বসল। ব্যাপারটা ওর খুবই খারাপ লেগেছিল। ও বলল, দাদাবাবু, দেখুন না যদি মাধবীদির মামার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ?

সুনীলেশ বলল, টাকা না হয়ে অন্য কিছু হলে পারতাম, বিদ্যাধর।

হরিভূষণবাবুর বাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই মাধবীদের শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আবার এল। মামার কাছ থেকে এবার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে এসেছে। সুনীলেশ ঠিকানাটা পড়ে দেখল, দমদমের কাছে কোনও একটা রাস্তার ঠিকানা।

—এ তো বহুদূর দেখছি মাধবী ? সুনীলেশ বলল।

—হ্যাঁ, দূর তো হবেই— আমার মামা গরিব কিনা, তাই কলকাতায় বাড়ি পেলেন না।

—গরিব তো আমিও মাধবী ! ওকথা বলছ কেন ?

—আপনি গরিব কিনা জানি না, তবে বড্ড অসহায়। বলে মাধবী আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল।

তারপরে একটুখানি থেমে বলল, দূর হলেও দু-একদিন আসবেন তো ?

—বলেছি তো যাব, সুনীলেশ বলল, অন্তত তোমার বিয়ের দিন তো যাবই !

মাধবী বলল, তাও তো একদিন দেখা হবার আশা রইল।

কতকগুলো ছোটখাট ঘটনা জীবনে গভীর রেখাপাত করে। মাধবীর সঙ্গে সুনীলেশের মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। আজকের দেখাই হয়তো শেষ দেখা। কিন্তু তবুও কেন যেন আজ মাধবীর চলে যাওয়া ওর কাছে খুব ক্ষুদ্র ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল না।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষের 'নূতন দিগন্ত' আত্মপ্রকাশ করেছে। আপিসে গিয়ে সুনীলেশ দেখে একখানা বই ওর নামে ডাকে এসে পৌঁছেছে। বইখানা নাড়াচাড়া করতে করতে ও ভাবছিল, নামটা খুব ভালো— 'নূতন দিগন্ত'। প্রচ্ছদপটটাও খুব সুন্দর হয়েছে। চৌষট্টি পাতার মাসিক পত্রিকা— তার মধ্যে ষোল পাতা বিজ্ঞাপন।

এ হেন বড়ো কোম্পানী নেই, যারা 'নূতন দিগন্তের' প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেয় নি।

প্রথম প্রবন্ধটাই সুনীলেশের লেখা। আরো ছুটো সাহিত্য প্রবন্ধ রয়েছে। একটা প্রবন্ধ বাংলার প্রাচীন কাব্য নিয়ে লেখা। আর একটা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে। খান-তিনেক ছুষ্প্রাপ্য Painting এর ফোটো রয়েছে। পাতা-ছুই পুস্তক সমালোচনা রয়েছে। মুরারি ঘোষের লেখা এক পাতা সম্পাদকীয়। সম্পাদক নূতন দিগন্তের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ নিয়ে লিখেছেন।

উদ্দেশ্য এবং আদর্শের কথা বলতে গিয়ে সম্পাদক শুধু একটা কথাই লিখেছেন— সারা পৃথিবীতে আজ আত্মাকে, স্বাধীন সত্তাকে পদদলিত করবার যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা সাহিত্যিকদের একটা পবিত্র কাজ। চিন্তার এবং বাক্যের স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের আত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। এমন এক নূতন ছুনিয়া গড়া প্রয়োজন, যেখানে লেখক এবং সাহিত্যিক দল প্রাণের আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে শত ধারায় নিজেদের বিকশিত করতে পারে।

সুনীলেশের তখন private বনাম public sector-এর প্রবন্ধের কথাটা মনে হল এবং মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসতে লাগল, মাত্র কয়েকদিন আগে মুরারি ঘোষের ইনিয়ে বিনিয়ে, কেঁদে কঁকিয়ে বলা— সুনীলেশ-বাবু, প্রবন্ধটা একটু ঘুরিয়ে লিখতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুনীলেশ মুরারি ঘোষের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল, Society for the Protection of Cultural Unity of India-র এক সভা হবে। সনির্বন্ধ অনুরোধ সে যেন আসে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অভিজিৎ মিত্র বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারার ওপর এক ভাষণ দেবেন।

অভিজিৎ মিত্র দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। প্রায় পঞ্চাশ খানা

বই লিখেছেন। মাসে অনেক টাকা রয়ালটি পান। তা ছাড়াও তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মুরুব্বীর পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। কোন সাহিত্যিককে পুরস্কার দিতে হবে— কোন বই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে তা নিরিখ করবার ভার তাঁর ওপর।

তিনি এখন সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতিতেও নেমেছেন। মাতব্বরী চালে কথা বলেন। পাড়ায় পাড়ায় সভাসমিতিতে তাঁর ডাক পড়ে। হবু সাহিত্যিকদের ভীড়ে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করা মুশকিল। দুখানা মোটর গাড়ি, বিরাট বাড়ি। সম্প্রতি তিনি ভারতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের যুব সমাজে, এমন-কি বিদ্বজ্জন মহলেও বিদেশী ভাবধারার জোয়ার এসেছে। সে ভাবধারা শুধু বিদেশী হলেও ক্ষতি ছিল না, তা আবার ভারতের প্রাচীন রীতিনীতির পরিপন্থী। তার মধ্যে উদগ্র বৈপ্লবিক মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।

এক সময় ছিল যখন নাম কেনবার জন্যে অভিজিৎবাবুও বৈপ্লবিক কথা বলতেন। তখনও তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় নি— তবে উদীয়মান লেখক হিসাবে খ্যাতি জন্মেছে। তখন তাঁর সাহিত্য আসরের ভাষণগুলি ছিল অন্য ধরনের। তিনি বলতেন, সাহিত্যকরা হচ্ছে বিপ্লববাদের পুরোগামী। কলম তরবারির চেয়েও বড়ো অস্ত্র। এই ঘুন-ধরা মরচে-পরা সমাজকে উচ্ছেদ করতে হলে সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু আজ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থের মসনদে বসে তাঁর ভাব বদলেছে, ভাষা বদলেছে। আজকাল তিনি বিদেশী লেখকদের রচনা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, সাহিত্য যুগধর্মী হলে তার মূল্য থাকে না— সাহিত্য হবে সর্বকালীন, সর্বযুগীয়। সাহিত্যের মধ্যে শুধু অভাব অভিযোগ সংগ্রাম আর ধর্মঘটের কথা থাকলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে আত্মিক ভাবধারার প্রকাশ মাত্র—কাল এবং সময়কে অতিক্রম করে লেখকের রচনা উর্ধ্বজগতের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলবে— মানুষের মনকে নিয়ে যাবে এমন এক

রাজ্যে যেখানে সংগ্রাম নেই, ক্ষুধা নেই, দৈনন্দিন জীবনের পঙ্কিলতা নেই— নেই কোনও চিন্তার আবর্জনা।

মুরারিবাবু চিঠির সঙ্গে একখানা দামী ছাপানো কার্ডও পাঠিয়েছেন। অভিজিৎ মিত্র Society-র সভার প্রধান অতিথি। আরও অনেক বিশিষ্ট বক্তা রয়েছেন।

সুনীলেশকে যেতেই হল। নিজের ততটা ইচ্ছা ছিল না— কিন্তু কাগজের তরফ থেকে ওকে পাঠানো হল।

মুরারিবাবুর সেই অভিজাত ফ্ল্যাট বাড়ির মাঝখানের ঘরখানাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

সুনীলেশ যেতেই মুরারিবাবু ওকে Society for the Protection of Cultural Unity of India-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সুনীলেশ ঘোষের নাম সবাই জানেন। আজ পরিচয় হল। সুনীলেশও তাঁদের অনেককে চেনে! তাঁদের মধ্যে অনেকেই এর আগে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা ছিলেন। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাবার পরেই এই সমস্ত দল পাত্তাড়ি গুটিয়েছে।

এককালে এঁরা গরম গরম বক্তৃতা করেছেন, কেউ কেউ দু-একখানা কাগজও চালিয়েছেন। দুনিয়ার এবং দেশের শোষিত জনসাধারণের জন্যে অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। তখন এঁদের পরনে ছিল ময়লা ধুতি, গায়ে মোটা কাপড়ের সার্ট বা পাঞ্জাবি এবং শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে একটা সস্তা খদ্দরের জহরকোট। মাথার চুল ছিল রুক্ষ, চোখ কোটরাগত। তখন এঁদের মুখ থেকে বেরুত বিপ্লবের হ্রেষা ধ্বনি। আর গা থেকে নির্গত হত বৈপ্লবিক স্বেদ বিন্দু।

দেশ স্বাধীন হবার পর এঁদের অতি-বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। দেশসেবার রূপ এখন বদলে গেছে। আজ শুধু মিছিল করলে আর গরম বুলি ঝাড়লেই হয় না—দেশের জনসাধারণের সামনে কার্যপন্থা উপস্থিত করতে হয়— গাছের ডগা থেকে নেমে এসে মাটিতে

তাল ঠুক্‌তে হয়। যদি মাটিতে ঠিকমত দাঁড়ানো না যায়, তাহলে পা ফস্কে বিস্মরণের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হয়।

সুনীলেশ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল, এঁদের মধ্যে অনেকে এখন দামী স্যুট পড়েছেন ; সিগারেটের টিন আর বিলিতি মাসিক পত্রিকা প্রায় সবারই হাতে। এঁদের চেহারায় দারিদ্র্যের মলিনতা আর নেই।

নির্ধারিত সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে অভিজিৎ মিত্র এসে সভাকক্ষে উপস্থিত হলেন। পরনে দামী খদ্দরের ধুতি, দোলানো কোঁচা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় সিল্কের চাদর, হাতে একখানা দামী লাঠি। সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে সেই মহালেখকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। Society-র সভাপতি ডাঃ গুণধর ঘোষ অভিজিৎ মিত্রকে দোরগোড়া থেকে হাত ধরে নিয়ে এসে প্রধান অতিথির চেয়ারে বসালেন।

সভাপতির নাতিদীর্ঘ ভাষণের পরে অভিজিৎ মিত্র বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারার ওপর বক্তৃতা শুরু করলেন।

সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে তিনি সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বললেন। তিনি টেবিল ঠুকে বললেন, কিন্তু বাংলাদেশে আজ বাঙালী কই ? কোথায় সেইসব বাংলা-মায়ের পূজারী, যাঁরা অকাতরে একদিন দেশের এবং দশের সেবায় নিজেদের জীবন বলিদান করেছিলেন ? কোথায় বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় দর্শন, ন্যায় আর নিষ্কাম জীবনবোধ ? এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে আজ বাঙালী লেখকরা যা লিখছেন, তাকে সাহিত্য বলা চলে না। ছাপার হরপে বেরুলেই তা সাহিত্য হয় না।

মিনিট-দুই শোনবার পর সুনীলেশ একটা বড়ো হাই তুলল। এটা সত্যিই প্রায় অশালীনতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলকাতা শহরে বসে এ-বক্তৃতা শুনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, তা সত্যি সুনীলেশের ছিল না।

ও চেয়ারের পেছন দিকে হেলান দিয়ে প্রায় নিদ্রামগ্ন হল। অর্ধতন্দ্রাজড়িত চোখে সুনীলেশ ভাবতে লাগল এই সমস্ত ভদ্রলোকদের কথার ঝুড়িতে মাত্র কয়েকটি শব্দ আছে। সেগুলিকে কোনও রকম করে একটার পর একটা কর্তা আর ক্রিয়ার সম্বন্ধ দিয়ে বসিয়ে দিলেই এঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেলে, শাস্ত্রীয় সংগীতের উদ্বোধন আসরে, রাজনৈতিক সভায় এবং সাহিত্যবাসরে একই ভাবধারা, একই বক্তব্য। যেন কেউ পেছন থেকে একই গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও এই সমস্ত পণ্ডিতের দল মানুষের চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে তবে ছাড়বে!

দৈনিক কাগজের রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষ সভায় ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে তিন কলাম হেডলাইন দিয়ে অভিজিৎ মিত্রের বক্তব্য প্রকাশিত হ'ল। সভার কর্মকর্তা মুরারি ঘোষ টেলিফোন করে সুনীলেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অভিজিৎ মিত্র স্বয়ং শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে বললেন—ছোকরা ক্ষমতা রাখে।

দৈনিক কাগজের ধারাই এই। প্রয়োজন বোধে তিলকে তাল করা হয় এবং তালকেও তিল করা হয়। একটা খবরের ওপর কাঁচি চালিয়ে তাকে যেমন কেটে ছেঁটে খর্ব করা হয়, তেমনি আবার আর একটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন স্ফীতোদর করা হয়, যে দেখলে চিনতে পারা যায় না।

কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও এ এক অন্য জগৎ। দিনরাত্রি টেলিপ্রিণ্টার মেসিনের গুঞ্জন, রিপোর্টারদের ত্রস্ততা আর সাব-এডিটরদের কাঁচি চালানো, সব কিছু মিলে এমন একটা কর্মব্যস্ততার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, যার একটা স্বাভাবিক উন্মাদনা আছে।

তাই সুনীলেশের জুটিয়ে দেওয়া প্রকাশকের আপিসের কাজটাকে সুধেন্দুবাবুর ভালো লাগছিল না। যুদ্ধের জন্য তৈরি সৈন্যকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার আদেশ দিলে যেমন হয়, সুধেন্দুবাবুর অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম হয়েছিল। আয় অর্ধেক কমে গেছে। কিন্তু তাহলেও এখন আর নিরম্বু উপবাস করতে হয় না। দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জোটে। কিন্তু ওঁর মনে বিশেষ কোনো ক্ষোভ ছিল না। এই বৃদ্ধ বয়সে শচীন্দ্রনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় নি, এবং যা করেই হ'ক ছেলেমেয়েদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারছেন, এই যথেষ্ট।

জীবনে ঘাতপ্রতিঘাতের আতিশয্য ঘটলে মানুষ জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে, দুঃখবাদী হয়, পৃথিবীর কোনো কিছুকেই ভালো বলতে ইচ্ছে করে না, কোনো কিছুকেই সম্মান প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য, এই কয়েক মাসের মধ্যে চিরআশাবাদী সুধেন্দু-বাবুর মধ্যেও এইসব লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

সুনীলেশ সব বুঝতে পারে, তাই ওঁর কথায় প্রতিবাদ করে না। সুধেন্দু বৃদ্ধ হয়েছেন— সুনীলেশের সঙ্গ ওঁকে বাচবার প্রেরণা দেয়, যৌবনের ছোঁয়াচ বৃদ্ধকে পুনরুজ্জীবিত করে। একজন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। আর একজন কেবল পথ চলতে শুরু করেছে। একজনের জীবন শুরু, আর একজনের জীবন সাঙ্গ।

একদিন সুনীলেশকে সুধেন্দুবাবু বললেন যে অধ্যাপক মুরারি ঘোষ ওঁকেও যেতে বলেছিলেন।

সুনীলেশ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম, সুধেন্দু বললেন।

—তারপর ?

—তোমাকে কথাটা বলবার জন্যেই এসেছি।

—বলুন তো! বলে সুনীলেশ চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বসল।

সুধেন্দু বললেন, মুরারিবাবু আমাকে কয়েকটা তর্জমার কাজ দিতে চাইলেন। কয়েকখানা পুস্তিকা তর্জমা করে দিতে হবে।

—পারিশ্রমিক ? সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল।

—সেই ব্যাপারটাই তো বড়ো অদ্ভুত লাগল। সুধেন্দুবাবু বললেন, এ তো দেখছি এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মুরারি ঘোষ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা তর্জমার জন্যে দেড়শো টাকা দিতে চাইলেন। আমার যেন কেমন খট্‌কা লাগল। তোমার সঙ্গে আলাপ না করে ওঁকে কিছু বলবার ভরসা পেলাম না। আর তা ছাড়াও, মুরারিবাবু আরও একটা লোভ দেখালেন। বছরখানেকের মধ্যে আমাকে বিদেশ ভ্রমণের একটা সুযোগ করে দিতে পারেন। 'বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা' এই সম্বন্ধে দু-একটা বিদেশী ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করতে হবে। তাতেও প্রচুর অর্থ আসবে। তোমাকে সত্যি কথা বলি সুনীলেশ, সমস্ত জিনিসটা আমার কাছে একেবারেই হেঁয়ালি মনে হল। বলো তো ব্যাপারখানা কি ?

সুনীলেশ বলল, হেঁয়ালির কি আছে ? অধ্যাপক মুরারি ঘোষের হাতে এখন যথেষ্ট ক্ষমতা। তিনি না পারেন এমন কাজ নেই।

সুধেন্দুবাবু বললেন, শুনেছি উনি এরই মধ্যে জনাছয়েক ভদ্রলোককে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

সুনীলেশ বলল, জানি, বিদেশে যাবার হিড়িক পড়ে গেছে। দেশে কস্মিনকালে যাদের কেউ চিনতো না, তারাও নির্বিবাদে সারা দুনিয়া ঘুরে এসে এক-একজন কেউকেটা হয়ে বসেছেন।

সুধেন্দুবাবু তখনও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধু বললেন, কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না।

শচীন্দ্রনাথ কাগজে একজন নূতন সাব-এডিটর নিয়োগ করলেন।

সবাই বুঝতে পারল তিনি সুধেন্দুবাবুর স্থলাভিষিক্ত হলেন। শচীন্দ্রনাথ কিন্তু সুনীলেশকে ডেকে বললেন, তোমরা ভেবো না, সুধেন্দুবাবুর জায়গায় ওঁকে নেওয়া হ'ল, উনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কিছু বিশেষ ধরনের উৎকৃষ্ট লেখার জন্যে ওঁকে নিয়েছি। উনি এ লাইনের লোক নন। এলাহাবাদের একটা কলেজে কিছুকাল পড়িয়েছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর ওঁকে রেকমেণ্ড করেছেন। উনি নাকি তু-তিনটে বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন।

যে কোনো আপিসে নূতন কেউ এসে কাজে লাগলেই তার সম্বন্ধে কিছুদিন সব আজগুবি প্রচার চলে। অনেকে অনেক কিছু বলে। হয়তো তার খানিকটা সত্যি, বাকিটা রং মাখানো। সুশান্ত বসু কাগজের আপিসে যোগ দেওয়া মাত্রই ওঁর সম্বন্ধে স্পেকুলেসন শুরু হ'ল। কেউ বললে, ভদ্রলোক চারটে বিষয়ে এম. এ.—চারটেতেই ফাস্ট ক্লাস। কেউ বা বলল, শুধুমাত্র বি. এ পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু স্পেশাল পারমিশন পেয়ে কলেজে পড়াচ্ছিলেন। একজন আবার বললেন, ভদ্রলোক শচীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আর যাই হোক-না-কেন কয়েকদিনের জন্যে সুনীলেশদের একটা আলোচনার খোরাক জুটল।

সুশান্তবাবুর বয়েস কেবল চল্লিশ পেরিয়েছে। এক মাথা রুক্ষ চুল। মনে হয় কোনোদিন মাথায় তেল দেন না। লম্বা সুঠাম চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। দেখলেই মনে হয়, চশমাটা খুলে ফেললে ভদ্রলোক একেবারে অন্ধ হয়ে যাবেন। চোখতুটো চশমার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখে চোখে একটা প্রতিভার ছাপ।

প্রথম তু-তিনদিন আপিসে এসে সুশান্ত চুপ করে বসে রইলেন। দৈনিক কাগজের হই-হল্লা ওঁকে স্পর্শ করল না। কি ভাবছেন, কি করছেন বোঝা মুশকিল। একটা কথাও কারুর সঙ্গে বললেন না।

সঙ্গে একখানা বই নিয়ে আসতেন। শুধু মাঝে মাঝে বইখানা পড়তেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর খুব কম ব্যাপারে ওঁর আসক্তি আছে।

সুনীলেশের সঙ্গেই তাঁর প্রথম আলাপ হল। সুনীলেশই সেধে আলাপ করল।

সুশান্তবাবু বললেন, ও! আপনিই সুনীলেশবাবু, সেই বিখ্যাত columnist? ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

দু-একটা কথা বিনিময়ের পর তিনি বললেন, দেখুন, আমি তো কোনও কাজই জানি না— আমাকে যে কি করতে হবে তাও বুঝতে পারছি না। শচীন্দ্রনাথ এখনও আমাকে কোনও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন নি। আপনারা সবাই কাজ করছেন, অথচ আমি স্রেফ বসে আছি। কি অন্যায় বলুন তো?

প্রথম দিন আলাপের পরই সুনীলেশ বুঝতে পেরেছিল, সুশান্ত এমন এক জগতের লোক যেখানে খুব কম লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। উনি ইংরেজি এবং অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করেছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দুটো বিষয়েই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, কিন্তু কলেজে পড়াতেন অঙ্ক আর ইতিহাস। কয়েক বছর আগে Romance of Mathematics বলে একখানা বই লিখেছিলেন। বইখানা এদেশে খুব বেশি বিক্রি হয় নি। বিদেশে ভালো কাটতি হয়েছিল। দেশ বিদেশের পণ্ডিতরা খুব সুখ্যাতিও করেছিলেন। কিন্তু আত্মভোলা বলে কয়েক বছরের মধ্যে সুশান্তর চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। ঠিকমত ক্লাসে যেতেন না— আর গেলেও পড়াবার বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে পড়াতেন। প্রিন্সিপাল কয়েক বছর কিছু বলেন নি— কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে লাগল, অধ্যাপক বসু পড়াতে পারেন না— তাদের রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কলেজ কমিটি সুশান্তকে ডেকে ওয়ার্নিং দিলেন। কিন্তু যাঁর জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞান বলে কোনো বস্তু নেই,

তাঁকে ওয়ার্নিং দেওয়া আর না দেওয়া সবই সমান। শেষ পর্যন্ত সুশান্ত নিজেই চাকরি ছেড়ে দিলেন।

এ প্রসঙ্গে একদিন কথা উঠতেই সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, কি বলব সুনীলেশবাবু, আমি একেবারেই অপদার্থ। বাপ-মায়ের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলাম। বাবা ছিলেন এক কলেজের অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালোবাসতাম। বই ছাড়া আর কিছু জানতাম না, চিনতামও না। আর তাছাড়া সংসারের হাবভাব বোঝবার অবসর পাই নি কখনও। বাবা অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন। মা কোনোদিন কিছু বুঝতে দেন নি ; চাকরি করেছি, আর বই পড়েছি। সংসার কাকে বলে জানবার সুযোগ হয় নি। আজ বুঝতে পারছি পড়াশুনো করতে গিয়ে জীবনের প্রধান ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আমার জীবনে এ এক চরম ট্র্যাজেডি।

কেন যেন সুনীলেশকে সুশান্তর খুব ভালো লেগে গেল। আপিসে এলেই দুজনে গল্পগুজব হত— কোনও কোনও দিন আপিসের পর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ত। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দুজনের আলাপ হত। এমন বিষয় নেই, যে সম্বন্ধে সুশান্ত অন্তত এক ডজন বই-এর রেফারেন্স দিতে পারতেন না— মায় পাবলিশার-এর নাম এবং বই-এর দাম পর্যন্ত।

সুশান্তর কয়েকটা প্রবন্ধ কাগজে বেরোতেই শচীন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখা একটা প্রবন্ধ পণ্ডিতমহলে সাড়া জাগাল।

কিন্তু মুশকিল হ'ল সুশান্তর আপিসে যাওয়া নিয়ে। ডিউটি যদি থাকে তিনটেয়, তো বারোটায় এসে বসে রইলেন। আর বারোটায় ডিউটি থাকে তো বেলা চারটে পর্যন্ত দেখা নেই। সুনীলেশের সহকর্মীরা বলত, একটা আস্ত পাগল, ওঁর চাকরি থাকবে না। সুনীলেশেরও যে মনে ভয় হত না তা নয়, তবে ও জানত, যে শচীন্দ্রনাথ প্রথমেই ওঁর সম্বন্ধে যে ধারণা করে নিয়েছিলেন, তাতে

হয়তো চাকরি নিয়ে কখনও গোলমাল হবে না। শচীন্দ্রনাথ যদি একবার কাউকে ঠিক চিনতে পারতেন, তবে কাগজের আপিসে সে ব্যক্তি অনায়াসে মৌরসি পাট্টা করে বসতে পারত।

কাগজে উড়িষ্যা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ক্রোড়পত্র বেরুবে। শচীন্দ্রনাথের আদেশে সম্পাদক এক একজনের ওপর এক-একটা লেখার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। সুনীলেশকে লিখতে বলা হ'ল উড়িষ্যায় সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ নিয়ে। সুশান্তর ওপর ভার পড়ল উড়িষ্যার ভাস্কর্য আর তৃতীয় পরিকল্পনায় রাজ্যের শিল্পায়ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবার। সম্পাদক বারবার বলে দিলেন, হাতে সময় আছে মাত্র পনের দিন। এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে।

সপ্তাহ শেষ হয়ে গিয়ে ক্রোড়পত্র বেরুবার দুদিন আগেও সুশান্তর লেখা যখন সম্পাদকের কাছে পৌঁছুল না, তখন তিনি শচীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলেন। শচীন্দ্রনাথ প্রমাদ গুনলেন। যদি শেষ পর্যন্ত লেখাটা নাই পাওয়া যায়! তিনি সুশান্তকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সুনীলেশেরও ডাক পড়ল। শচীন্দ্রনাথ চতুর লোক। সুশান্ত যদি শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ দুটো না লিখতে পারেন, তাহলে নিদেন পক্ষে সুনীলেশ রয়েছে, একটা কিছু ব্যবস্থা করে নিতেই হবে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শচীন্দ্রনাথকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, সুশান্তকে দিয়ে made to order কোনও কিছু লিখিয়ে নেওয়া ভয়ানক মুশকিল।

শচীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ দুটো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই সুশান্ত যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মিনিট পাঁচেক ধরে স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁর মনে পড়ল উড়িষ্যার ভাস্কর্য আর পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুটো প্রবন্ধ লিখবার কথা ছিল বটে। তিনি লজ্জায় জিভ কেটে বললেন, স্যার

আমি দুঃখিত। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। লেখা দুটো কালকে দিলে হবে তো ?

শচীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, আজ্ঞে না স্যার, ওটা আজই চাই। এবং রাত্রি দশটার মধ্যে।

সুশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে তো স্যার, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে আছে; আমাকে এখুনিই লিখতে বসতে হবে।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, যা ভালো মনে হয় করুন। তবে লেখা আমার আজ রাত্তিরেই চাই। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, আপনার হাতে ওটা কি বই সুশান্তবাবু।

সুশান্ত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, এই বইখানাই তো সব গোল পাকিয়েছে স্যার। এটা আফ্রিকার একটা উপজাতির ওপর লেখা একখানা বই। আশ্চর্য, আমাদের দেশের দু-একটা উপজাতীয়দের সঙ্গে এদের চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে বেশ কিছু মিল রয়েছে। এমন কি ভাষাতেও। এ ব্যাপারটা নিয়ে যদি কেউ রিসার্চ করেন তবে হয়তো একটা রহস্যের সমাধান হয়ে যেতে পারে। তবে প্রচুর সময় এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, এইখানে ছেদ না টানলে তাঁকে আফ্রিকান ভাষা এবং আচার-ব্যবহারের উপর একটা দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা সুশান্তবাবু, এখন আসুন, ও ব্যাপারটা সম্বন্ধে বরং পরে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখবেন। কিন্তু আপাতত উড়িষ্যা সম্বন্ধে লেখা দুটো সেরে ফেলুন। তারপর সুনীলেশকে উদ্দেশ করে বললেন, একটু দেখো তো ভাই, প্রবন্ধ দুটো যাতে লেখা হয়!

সুনীলেশ হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সুশান্তর পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, আচ্ছা মশাই বলুন

তো, একটা বই পড়তে পড়তে অন্য একটা কিছু ভাবা যায়! কটা জিনিস এক সঙ্গে ভাবব!

সুনীলেশ কথা বলল না। ও জানত, কথা বললেই সুশান্তর প্রবন্ধ লিখতে দেরি হয়ে যাবে।

সেদিন অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরতেই বিদ্যাধর একখানা চিঠি এনে সুনীলেশের হাতে দিল। মাধবীর বিয়ের চিঠি। কলিকাতা নিবাসী শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর সাথে হরিভূষণবাবুর ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মাধবীর শুভ পরিণয়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।

মাত্র মাসছয়েক মাধবীরা এখান থেকে চলে গেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে হরিভূষণবাবু মাধবীর বিয়ে ঠিক করতে পেরেছেন, ভদ্রলোকের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। বিদ্যাধর মাসের মধ্যে কমকরেও বারচারেক মাধবীদের দমদমের নূতন বাড়িতে যায়। এর মধ্যে দু-একদিন মাধবীর কাছ থেকে দু-একটা স্মারকও নিয়ে এসেছে, কোনো দিন একটা মাছের চচ্চড়ি, কোনোদিন বা একবাটি মাংস। মাধবী বলে দেয়, ভালো করে বসে সুনীলেশদাকে খাইও। সুনীলেশদা পেটপুরে খেতে পায় না।

কয়েকদিন আগে বিদ্যাধর অবিশ্যি বলেছিল, মাধবীর একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। পাত্রের অবস্থা খুব ভালো। কাঠের ব্যবসা আছে। পেল্লায় বাড়ি, গাড়ি। তবে বয়েসটা একটু বেশি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পক্ষ।

সুনীলেশ সেদিন শুনেও শোনে নি। আপিসের কাজকর্ম দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে। তারপর আবার এখন সুশান্ত এসে জুটেছেন! হাতে সময় নেই বললেই চলে। মাধবীর বিয়ে হবে এই কথাটাই ওর কাছে পরম সত্য বলে মনে হয়েছিল। সেদিন ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কোষ্ঠী বিচার করবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

বিয়ের চিঠি পড়েই সুনীলেশ বিদ্যাধরকে ডেকে বলল, মাধবীর বিয়ের চিঠি এসেছে।

প্রথমে বিদ্যাধর কথা বলল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, তাহলে বোধহয় সেই দোজবরের সঙ্গেই মাধবীদির বিয়েটা ঠিক হ'ল। তা হ'ক্ না বাবু দোজবর। মেয়েটা সুখেশান্তিতে থাকবে তো ?

সুনীলেশ লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। তারাভরা আকাশ। শীতের আমেজ গায়ে লাগছে। উত্তুরে বাতাসের কনকনানি তখনো শুরু হয় নি। তবুও গভীর রাতের চাঁদ কুয়াশায় ঢাকা। ১৩ই অগ্রহায়ণ মাধবীর বিয়ে। আজ ১০ই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে ? মাধবীকে কাছে টেনে নেবার সময় আর একটি নববধূর ঘোমটা-পড়া মুখ সামনে এসে বাধা দেবে না তো ? আর মাধবী ?

সুনীলেশ বাইরে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, টবের সেই রজনীগন্ধাটা কবে শুকিয়ে গেছে !

পরদিন সকালেই বিদ্যাধর সুনীলেশকে চেপে ধরল। মাধবীদির বিয়ের আর তিনদিন বাকি। আজ রাত্তিরেই তাকে দমদম যেতে হবে। দিদির মামীমার শরীর ভালো নেই। কাজকর্ম করবে কে ?

সুনীলেশ বিদ্যাধরকে বাধা দিল না। দু-একদিন আগে গিয়ে মাধবীর বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য করা হয়তো সত্যিই প্রয়োজন। কিন্তু মুশকিল হ'লো বিদ্যাধর যখন তাঁর নিজের যাবার কথা তুলল। সুনীলেশ বলল, বিয়ের দিন এসে মাধবীর জন্যে একখানা শাড়ি নিয়ে যেও। আমার যাওয়া হয় কি না ঠিক নেই।

বিদ্যাধর বলল, আমি আর আসতে পারব না। যা দেবার আজই দিয়ে দাও বাপু।

সুনীলেশ পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে বিদ্যাধরের হাতে দিয়ে বলল, তুমি যা পার কিনে নিও। কেনাকাটা আমার আসে না।

শুধু আপিসে বেরুবার আগে মাধবীর জন্যে দু-লাইনের একখানা চিঠি লিখে রেখে গেল।—

কল্যাণীয়াসু মাধবী,

তোমার বিয়েতে যাওয়া হয়তো হবে না। প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। ইতি—

আঃ সুনীলেশ ঘোষ।

বিদ্যাধর মাধবীদের ওখানে চলে যেতেই সুনীলেশকে হোটেলের আশ্রয় নিতে হ'ল। এখন তো আর মাধবী নেই, যে কোথায় খাওয়া হবে, কি খাওয়া হবে সব কিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে। তারপর গড়গড় করে বলে যাবে— মামীমা বলেছেন যদি অসুবিধা না হয়, তবে আমাদের ওখানেই এবেলা চারটি খেয়ে নেবেন।

হোটেল থেকে খেয়ে আপিসে যেতেই সুশান্তর সঙ্গে দেখা। সুশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, আজকে এমন উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা কেন? খাওয়া হয় নি বুঝি?

সুনীলেশ বলল ও হোটেল থেকে খেয়ে এসেছে।

—হোটেল কেন মশাই? সুশান্ত বসুর একখানা ফ্ল্যাট বাড়ি রয়েছে তো? সেখানে যেতে কি হয়েছিল শুনি?

সুনীলেশ বলল, জানেন সুশান্তবাবু, একবার রাস্তায় একটা অন্ধ লোক আর একটা অন্ধ লোকের কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেদম মার খেয়েছিল।

—ও বুঝেছি, বলতে চাইছেন আমরা দুজনেই জীবন-সংগ্রামে অন্ধ এই তো? কথাটা ঠিক— কিন্তু আমার অবস্থা আপনার চাইতে অনেক ভালো মশাই, অনেক ভালো।

সুনীলেশ ততক্ষণে রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

জাগতিক ব্যাপারে আত্মভোলা ভদ্রলোকের কাহিনী শুনতে বোধহয় ভালোই লাগবে।

আনন্দে উদ্ভাসিত সুশান্তর দুটো চোখ চশমার ভেতর দিয়ে সুনীলেশের দিকে নিবদ্ধ হ'ল। তারপর উনি বললেন, আমার গৃহিণী নেই কিন্তু ম্যানেজারেস্ আছে!

সুনীলেশ বুঝতে পারল ঘটনাটা রসঘন। শুধু বলল, বাড়ির ম্যানেজারেস্ না মনের ম্যানেজারেস্?

—এখন পর্যন্ত মনেরই ম্যানেজারেস্ বলতে পারেন, সুশান্ত বললেন। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, উষা খুব ভাল মেয়ে। এলাহাবাদ থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওর বাবাও অধ্যাপক ছিলেন। ওখানকার একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। বছরদশেক আগে রিটায়ার করেছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি এলাহাবাদ থাকতেই ভদ্রলোক মারা যান। তারপর উষা কলকাতায় ওর বড়দার বাড়িতে চলে আসে।

সুনীলেশ বলল, কিন্তু সুশান্তবাবু নামক ভদ্রলোকের যিনি ম্যানেজারেস্, তাঁরও এলেম বড় কম নেই। ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

—দেখবেন, আলাপ করিয়ে দেব। এলেমের পরিধি খুব অবিশ্যি একটা কিছু নয়। এমনিতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক বছর আগে ইতিহাসে এম. এ. পাস করেছে। বি. এ পড়বার সময় ওর পিতৃদেবের অনুরোধে ওকে কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। বুদ্ধিমতী, চতুর এবং বাচনদক্ষ, কিন্তু গভীরতা কম। পড়াশুনো করতে চায় না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বইকে ও ভালোবাসলো না। আর তাছাড়া আসল কথা কি জানেন সুনীলেশবাবু? মেয়েদের যদি রূপ থাকে তো জ্ঞানের পথ কেমন করে যেন আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে যায়। সহজে বাজী মাৎ করবার একটা রাস্তা থাকলে কঠিন পথে কে যেতে চায় বলুন!

সুনীলেশ বলল, উষা দেবী বুঝি খুব সুন্দরী ?

সুশান্ত একটুখানি হেসে বললেন, আমার চোখে তো সুন্দর লাগবেই ! আপনি নিজের চোখে দেখে বিচার করবেন ।

—উষাদেবী থাকেন কোথায় ? সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল ।

সুশান্ত বললেন, আমার বাড়ির খুব কাছেই কিংবা বলতে পারেন আমি ওর খুব কাছে থাকি । এলাহাবাদ থেকে এখানে চাকরি নিয়ে আসবার আগে উষাই ওদের বাড়ির কাছে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছিল । শুধু ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেওয়াই নয়, আগে থেকেই টেবিল, চেয়ার, খাট থেকে শুরু করে সবকিছু জোগাড় করে ফ্ল্যাটটাকে বসবাসের উপযোগী করে রেখেছিল । নিজেদের রান্নার লোকটাকে পাচার করেছিল আমার ফ্ল্যাটে । ওর বউদি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন । আজকালকার দিনে পুরনো রাঁধুনী হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানে প্রায় পুত্রশোকের সামিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে তিনিও রাজী হয়ে গিয়েছিলেন ।

সুশান্তর আপিস-বেরুনো পর্ব এক সাংঘাতিক ব্যাপার । উষা ডিউটি চার্টটাকে বড়ো বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে লিখে সুশান্তর টেবিলের সামনে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল । শুধু তাই নয় । রোজ আপিস যাবার ঘণ্টা খানেক আগে সুশান্তর ফ্ল্যাট-এ এসে খাইয়ে দাইয়ে আপিসে রওনা করে দিয়ে তবে রেহাই । তাও চিন্তার অন্ত নেই— আপিসে না গিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের পুরনো বই-এর দোকানে দিনটা কাটিয়ে না দেয় । বলা যায় না । ও সুশান্তকে পুরনো বই-এর দোকানে দাঁড়িয়ে দু'শো পাতার বই পড়ে ফেলতে দেখেছে । একবার যদি বইতে মন বসল তাহলে সুশান্তর সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না । রাত্রিবেলা উষার আসা হত না— একা আসাটা দৃষ্টিকটু, তার উপর উষা নিজে মেয়েদের একটা কলেজে সন্ধ্যাবেলা পড়াতে যেত । হলে কি হবে, রোজ রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ির ভৃত্যকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখে পাঠাত, যেন চিঠি পাওয়া মাত্র সুশান্ত

খেতে বসে যায় ইত্যাদি। চাকরের ওপর অর্ডার ছিল, দাদাবাবুর খাওয়া না হলে যেন বাড়ি ফিরে না আসে!

বেশ লাগল সুনীলেশের। সত্যিই, সুশান্তকে এমনি করে দেখবার কেউ না থাকলে বেচারার দুরবস্থার শেষ থাকত না। কিন্তু আশ্চর্য! এখনও উষাদেবী সুশান্তর স্ত্রী হন নি কেন? ভদ্রলোক এখনও জীবনের হাটে পসরা নিয়ে জমিয়ে বসতে পারেন নি বলে, না আত্মভোলা খামখেয়ালী সুশান্তকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক অসুবিধা রয়েছে বলে?

সুশান্ত সুনীলেশকে একদিন দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন করলেন। ঠিক হ'ল খাওয়াদাওয়া সেরে দুজনে একসঙ্গে আপিস যাবে।

সুনীলেশ গিয়ে দেখল উষাদেবী কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজের তদারক করছেন। ডাকা হাঁকি করে ভৃত্যকে উপদেশ দিচ্ছেন।

সুশান্ত ডেকে বললেন, উষা, এস আলাপ করিয়ে দি। ইনিই হচ্ছেন আমাদের সুনীলেশ ঘোষ যাঁর লেখা পড়ে তোমরা সবাই তারিফ কর।

নমস্কার এবং প্রতি নমস্কারের পালা শেষ হ'ল। পরিচয় করিয়ে দিয়েই সুশান্ত অন্য রাজত্বে চলে গেলেন, যেখানে উষা কিংবা সুনীলেশের প্রবেশাধিকার নেই। সুশান্ত গভীর মনোনিবেশে কি যেন লিখতে শুরু করলেন। ওঁর এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে উষার পরিচয় ছিল। সুনীলেশেরও হালে পরিচয় হয়েছে।

উষা বলল, কেন আসেন এই ভদ্রলোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে বলতে পারেন? আমার সন্দেহ আছে ও খাবার টেবিলে বসবার আগে আর একটি কথাও বলবে কিনা! সুশান্ত এখন আফ্রিকান এবং ভারতীয় সংগীতের এক তুলনামূলক আলোচনা লিখছে। কাল এসে হয়তো দেখবেন টি. এস. এলিয়টের ওপর প্রবন্ধ লিখছে। ওর কাছে

অবশ্য সবই সমান। শুধু পড়বার এবং লিখবার একটা সুযোগ পাওয়া নিয়ে কথা!

সুনীলেশ বলল, সুশান্তবাবু আমাদের মতো লোক নন। তাই হারিয়ে গেলেও আবার খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষ করে আপনার মতন একজন কলাম্বাস যখন রয়েছেন। সুশান্তবাবু তো আপনারই আবিষ্কার।

উষা বলল, হয়তো তাই! কিন্তু আজ সুশান্ত আর আবিষ্কার নয়, আমার জীবনের একটা গভীর সত্য। আমি জানি, আমি এসে না খাওয়ালে ওর খাওয়া হবে না-- হয়তো গেঞ্জী পরে আপিস চলে যাবে, তারপর অর্ধেক রাস্তা থেকে আবার ফিরে আসবে। ওকে নিয়ে সত্যিই খুব মুশকিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে সুশান্ত আর সুনীলেশের আপিস যেতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। বার্তাসম্পাদক যেন সুনীলেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। যেতেই তিনি বললেন, স্বয়ং মালিক ওকে একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। শচীন্দ্রনাথের আদেশ সুনীলেশ যেন নিজেই লেখে, অন্য কেউ লিখলে চলবে না।

একটা বিদেশী কোম্পানী পুরনো কলকাতা শহরটাকে ভেঙে-চুরে একটা নতুন শহর গড়বার প্ল্যান দিয়েছে। কয়েক শো কোটি টাকা খরচা হবে। প্ল্যানটা যদি কার্যকরী করা যায়, তাহলে কলকাতার চেহারা বদলে যাবে। সে হবে এক নতুন শহর। রাস্তাঘাটে ভিড় থাকবে না। বাসে ট্রামে ঠোকাঠুকি লাগবে না, বস্তি থাকবে না। বড়ো বড়ো ইমারৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। দশ বছর পরে কলকাতায় যারা আসবে, তারা আড়াই শো বছরের বেঁকে, কুঁজো-হয়ে-যাওয়া বৃদ্ধা কলকাতার স্থানে দেখতে পাবে এক নৃত্যরতা সুন্দরী উর্বশীকে।

এর মধ্যে শচীন্দ্রনাথ নূতন কলকাতা গড়বার প্রস্তাব সমর্থন করে এক বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, কলকাতার অনেক

বাসিন্দাদের এতে আপত্তি রয়েছে। তারা কলকাতার কলকাতাত্বকে হারাতে চায় না। কলকাতার রক, আর এঁদো গলি, ধোঁয়া আর মিছিল, জল-জমে-যাওয়া ঠনঠনে আর মানিকতলা, এদের জীবনে এমন এক আবেশের সৃষ্টি করেছে যে, এরা sky scrapers, চওড়া সুন্দর রাস্তা, ফুলভরা পার্ক আর ভিড়বিহীন ফুটপাথ পছন্দ করে না।

তাই তিনি সুনীলেশকে আদেশ দিয়েছেন, স্বপ্নের নতুন রূপসী কলকাতাকে সমর্থন করে একটা জোরালো প্রবন্ধ লিখতে হবে।

শচীন্দ্রনাথের আদেশ পেয়েই সুনীলেশ সুশান্তর কাছে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। তারপর আস্তে আস্তে কলকাতা-প্রসঙ্গ তুলল।

সব শুনে সুশান্ত বললেন, কলকাতাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া কেন বাপু? কত মাঠ ঘাট বাংলা দেশে পড়ে আছে; যত খুশি sky-scraper তুলুক না— কার কি এসে যায়?

সুনীলেশকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে সুশান্ত আবার বললেন, জানেন সুনীলেশবাবু, পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয়েক সভ্য শহর আছে। তার মধ্যে কলকাতা একটা। সবগুলো সভ্য শহরই প্রাচীন। সেখানে মাছি আছে, মশা আছে, বস্তি আছে, প্রচুর অকেজো এবং অপদার্থ লোকও আছে। লেখক এবং শিল্পীরা সেসব শহরে খেতে পায় না। পণ্ডিতরা আস্ত জামাকাপড় পরতে পায় না। সেসব শহরের অলিতে গলিতে চা এবং কফিখানার সমাবেশ। কিন্তু তবুও সেসব জায়গার মানুষগুলি বেঁচে আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অভাব তাদের জীবনযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে নি।

সুনীলেশ কিন্তু তখনও আবিষ্টভাবে একটা চেয়ারে বসে ছিল। সুশান্তর অর্ধেক কথা ওর মাথায়ই ঢুকল না।

কিন্তু সত্যিই আবার প্রমাণ পাওয়া গেল কলকাতার মানুষগুলো মরে নি। সেই রকে-বসা, গোপাল কাছা করে জল-ভেঙে-চলা মানুষগুলি প্রতিবাদ করল তারা বলল— আমাদের শহরটাকে যেমন

আছে ঠিক তেমনি থাকতে দাও। নতুন শহর করতে চাও ভালো কথা। কিন্তু এখানে নয়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরুল। পাড়ায় পাড়ায় পার্কে পার্কে সভা হল। প্রথমে কয়েকজন অখ্যাত লোক বক্তৃতা করল। তারপর নেতারা আসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ মিত্র কাগজে বিবৃতি দিলেন— জনগণের দাবি অবহেলা করা চলে না। কলকাতার মতো আর দশটা শহর হক আপত্তি নেই; কিন্তু পুরনো কলকাতাকে যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকতে দেওয়া হক।

রক্ষা, সুনীলেশের লেখাটা তখনো কাগজে ছাপা হয় নি। কয়েকদিন পরে শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুনীলেশকে ডেকে পাঠিয়ে brief করলেন। তিনি বললেন, জাগ্রত জনমতের বিরুদ্ধে সোজাসুজি লিখতে যাওয়া ঠিক হবে না।

সুনীলেশ সেবারকার মতো বেঁচে গেল। কলকাতায় ওরই মতো আরও কতকগুলো লোক ছিল, নইলে এবার ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি হত! ও একরকম প্রায় স্থির করে ফেলেছিল, প্রয়োজন বোধে চাকরি ছেড়ে দেবে।

আপিস থেকে বেরিয়ে সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, চোখ বুজে একটু চিন্তা করুন, দেখবেন নতুন কলকাতায় ধুতি নেই, পাঞ্জাবি নেই। শুধু আছে হিপ্ পকেটওয়ালা প্যাণ্ট-পরা এক শ্রেণীর লোক যাদের নিজস্বতা বলে কিছু নেই। তারপর মনশ্চক্ষে ছ'শো কোটি টাকার নতুন কলকাতার সান্ধ্য জীবনকে অনুভব করুন; দেখবেন গীটার আর অ্যাকর্ডিয়ানের সঙ্গে তাল রেখে ছেলেমেয়েরা সব হাওয়াইয়ান নাচ নাচছে। Sky-scraper ওয়ালা নতুন কলকাতার স্কুল-কলেজে একবার ঘুরে আসুন, শুনবেন মা ছেলেকে কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন, আমার ছেলে বাংলা বল্‌টে পারে।

দিন চলে। কাগজের আপিসের টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র অনবরত

খবর পরিবেশন করে চলেছে। সুনীলেশ মধ্যে মধ্যে ভাবে, কোন্ উৎস থেকে এমন খবরের বন্যা চিরকাল ধরে বয়ে চলছে ? এর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। স্রোতস্বিনী নদীর মতো এর কোনো শেষ নেই। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারার মতো লক্ষ কোটি খবর সারা দিন মাস, বছর ধরে অক্লান্তভাবে বর্ষিত হচ্ছে।

সুনীলেশের আর একটা scoop সাড়া জাগাল। নারকেলডাঙার ক্ষিতীশ দত্ত তার এক মূক এবং বধির ভগিনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। ঘটনাটা খবরের কাগজে তিন কলাম banner headline দিয়ে বেরুল। সেদিন শ্যামবাজার ভবানীপুর আর টালীগঞ্জের চায়ের দোকানগুলোর প্রাতঃকালীন খদ্দেররা পা শক্ত করে বসে খবরটা পড়ল। অনেকে ভাবল যদি হত্যা করে সমস্যার সমাধান হত তাহলে হয়তো একদিনেই সব গোলমাল চুকে যেত। কিন্তু হত্যা সবাই করতে পারে না। আর করতে পারলেও কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না।

ক্ষিতীশ দত্ত পূর্ববঙ্গের লোক। কিছু জমিজমা ছিল। সব ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসে নারকেলডাঙার এক বস্তিতে উঠেছিল। তারপর সরকারী আপিসে ধরনা দিতে দিতে কিছু সরকারী সাহায্যও মিলেছিল। তাই দিয়ে ক্ষিতীশ একটা কাটা কাপড়ের দোকান দেয়। ওর বংশে কেউ কখনও ব্যবসা করে নি। বেশ বড়ো সংসার ক্ষিতীশের। মা, দুটি ভাই, একটি বোবা এবং কালা ভগিনী এবং নিজে। কায়ক্লেশে দিন চলে। কিন্তু তৈরি জামাকাপড়ের ব্যবসায়ে ভাটা পড়ল। বড়ো বড়ো মিলগুলো বড়ো বড়ো রাস্তার মোড়ে নিজেদের দোকান খুলতে লাগল। বিরাট বিরাট সব দোকান; চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি দিয়ে তারা ছোটোখাটো ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দোকানগুলো ছিনিয়ে নিতে

লাগল। সেসব দোকানে ভালো ভালো ডিজাইনের তৈরি জামাকাপড় পাওয়া যায়। দামও সস্তা! ক্ষিতীশ দত্তদের ছোটো দোকানে আর যায় কে?

প্রথমে ক্ষিতীশ দত্তর মতো অতি ক্ষুদ্র পসারীদের ওপর আঘাত এল। বছর দু-একের মধ্যে ১৫।২০ বছরের পুরনো ব্যবসায়ীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। বছর খানেক লড়াই করবার পর ক্ষিতীশ দত্ত এবং আরও অনেকের দোকান উঠে গেল।

ক্ষিতীশের সংসার আর চলে না। ভাই দুটো বড় হয়েছিল। অবস্থা বুঝে যে যার মতো কেটে পড়ল। মা আর দাদার অনেক স্নেহ ওরা জীবনে পেয়েছিল। কিন্তু এখন প্রাণ বাঁচাবার পালা। এই মোকা— দাদার রোজগার নেই, চট্‌পট্‌ কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ! যাবার আগে ওরা মায়ের কাছে চিঠি লিখে রেখে গেল— মানুষ হলে তবে ফিরব।

দু-বছর ক্ষিতীশের মা অপেক্ষা করলেন। যখন ছোট ছেলে দুটো মানুষ হয়ে আর ফিরল না, তখন মনের দুঃখে তিনি শুকিয়ে মরলেন। বাকি রইল ক্ষিতীশ আর চিরদুঃখী মলিনা। মলিনা মনের দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না, শুধু ড্যাব ড্যাব করে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকত। ক্ষিতীশ দুস্তর সমুদ্রে জীবনতরী ভাসাল। মাসে মাসে খাওয়া খরচ বাবদ কিছু কিছু দেবে বলে ও মলিনাকে এক কাকার বাড়িতে রেখে এল। কিন্তু খরচ জুটবে কোত্থেকে? দরিদ্র কাকা, নিজের সংসার চলে না, মলিনাকে তিনিই বা খেতে পরতে দেবেন কোত্থেকে? দু-মাস বাদে ক্ষিতীশকে পাকড়াও করে তিনি বললেন, দেখ বাপু! হয় টাকা দাও, নাহয় মলিনাকে নিয়ে যাও!

ভাই-এর বোবা মেয়ের প্রতি কাকার দরদ ছিল না তা কখনও হতে পারে না। যা দিনকাল পড়েছে, মলিনা ভ্রাতুষ্পুত্রী না হয়ে নিজের কন্যা হলেও, সমস্যাটা বড় কিছু একটা কম হত না। ক্ষিতীশ জানত, কাকা অপারগ। কিন্তু তবুও পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মরিয়া

হয়ে দু-মাস কাজের চেষ্টা করেছে, কোনও কাজই জোটাতে পারে নি। শুধু মলিনার খরচটা চালাতে পারবার মতো একটা চাকরি পেলেও তো হত! তাও জুটল না!

কাকার কাছে ধরা পড়ে ক্ষিতীশ দুদিনের সময় চেয়ে নিল। বলল দুদিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে। সে-রাত্তিরে কাকা অনেকদিন পরে একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলেন। ক্ষিতীশ টাকাটা দিলে বেশ হবে! বেচারা মলিনা! অসহায়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দু-মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা যার নেই, তাকে ধিক্!

গভীর রাত্তিরে একটা কৃষ্ণবর্ণ ছায়ামূর্তি কাকার বাড়ির বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেল। সেখানে মলিনা শুয়ে ছিল।

ছায়াটা শেষবারের মতো একবার মলিনার দিকে চেয়ে দেখল। ক্ষিতীশের মাত্র একটিই ভগ্নী। বড়লোকের ভগ্নী হলে, বোবা আর কালা হলেও হয়তো একদিন সানাই আর আলোর রোশনাইতে মলিনার বিয়ে হয়ে যেত।

দুটো শক্ত হাত আস্তে আস্তে মলিনার গলাটাকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল। তারপর হত্যাকারী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিঃশব্দে একটি নিঃস্ব পরিবারের ইতিহাসের ওপর যবনিকাপাত হল। দারিদ্র্য ক্ষিতীশের মন থেকে দয়ামায়া এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলিকে আগেই মুছে ফেলে দিয়েছিল। মলিনাকে হত্যা করে আজ সে শুধু অমানুষিকতার শেষ স্বাক্ষর রেখে গেল।

আপিসে এসে সুশান্তর কাছে বসতেই সুশান্ত সুনীলেশকে বলল, হ্যাঁ মশাই, আপনি মানুষ না কসাই?

সুনীলেশ বলল, কেন?

—এই রকম অমানুষিক একটা ঘটনা লিখলেন কি করে?

সুনীলেশ বলল, রোগী মরে গেলে কি ডাক্তাররা কাঁদে?

—তা বটে, রোজ সমাজের বুকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও যদি ছাপার হরফে বেরুত, আর যদি মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাগুলোর সহস্রভাগের এক ভাগও আমরা পালন করতাম, তাহলে আমাদেরও মলিনার মতো মূক ও বধির হয়ে যেতে হত। কিন্তু আমরা হাসছি, খেলছি, সিনেমায় যাচ্ছি, সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করছি।

তারপর সুশান্ত চেয়ার ছেড়ে জানলার ধারে গেলেন। চশমাটা খুলে ফেলে বলতে লাগলেন—

"Eyes that last I saw in tears
Through division
Here in death's dream kingdom
The golden vision reappears
I see the eyes but not the tears
This is my affliction."

মাধবীর বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। সুনীলেশ ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নিজের কাজ, পিসীমার খবরদারী, তার ওপর সুশান্তর সঙ্গ, সব মিলিয়ে সত্যিই ও মাধবীকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। বিদ্যাধর কিন্তু মাঝে মাঝেই তাগিদ দিত— মাধবীদির বাড়িতে একদিন যাওয়া উচিত। বিয়ের সময়ে না যাওয়াটা খুব খারাপ হয়েছে। মাধবীদির মামা খুব দুঃখ করছিলেন।

সুনীলেশও অনেকদিন ভেবেছে, বিয়েতে যখন যাওয়া হয় নি, তখন মাধবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাওয়া প্রয়োজন, শুধুমাত্র ভদ্রতার দিক থেকে বিচার করলেও।

কাগজের আপিসের তাড়াহুড়ো আর scoop-এর উত্তেজনায় মাধবীর স্মৃতি এই কয়েক মাসের মধ্যেই কেমন করে যেন ম্রিয়মান

হয়ে পড়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা, তারা-ভরা আকাশের নিচে বসে ছাদের ওপরকার সেই রজনীগন্ধাটার দিকে তাকালে কেমন করে যেন মাধবীর কথা মনে পড়ত। মাধবী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে দমকা হাওয়ায় রজনীগন্ধার চারাটা ভেঙে গিয়েছিল, আর সেটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।

সন্ধ্যেবেলা বিদ্যাধর বাইরে গিয়েছিল। আসবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে এল। ও পড়তে পারে না; কিন্তু তবুও আন্দাজ করে বলল— বোধহয় মাধবীদির চিঠি।

সত্যিই তাই। মাধবী একখানা চিঠি লিখেছে।

শ্রীচরণেষু

সুনীলেশদা, বিয়ের সময় আশীর্বাদ করেছিলেন যেন সুখী হই। কেমন সুখী হয়েছি একবার দেখেও গেলেন না! কবে আসবেন, জানালে গাড়ি পাঠাব।

ইতি—মাধবী

মাধবীর চিঠিখানা সত্যিই রোমাঞ্চকর। বিশেষ করে শেষ লাইন কটা— "কবে আসবেন জানালে গাড়ি পাঠাব।"

সুনীলেশের সাংবাদিক মনে এক অনাগত আশঙ্কার ছায়া পড়ল। মাধবীর বাড়িতে এক্ষুনি যেতে পারলে ভালো হত। মাধবী ওকে যেন ডাকছে— এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করবার জন্যে! সুনীলেশের মনে হতে লাগল, এ যেন শচীন্দ্রনাথকে বলা গল্পের লাল ঘোমটা পড়া বউটি ওর অবচেতন মনের দরজা দিয়ে কোনও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মায়াময় লোকে প্রবেশ করেছে।

পরদিন বিকেলেই সুনীলেশ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। নীচতলায় মস্ত বড়ো কাঠের গুদাম। গদিঘরের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মুখে পাহারারত এক নেপালী দরোয়ান দাঁড়িয়ে। তার অনুমতি ছাড়া কারুরও ওপরে ওঠবার অধিকার নেই।

সুনীলেশ সিঁড়ির সামনে যেতেই দরোয়ান পথ আগলে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক গদিঘর থেকে দৌড়ে এসে ওর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। যখন শুনলেন আগন্তুক বড়ো কর্তার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর পরিচিত তখনই জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশ করে সুনীলেশকে ওপরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

মাধবীর স্বামী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বনেদী ব্যবসায়ী এবং ধনী। তাঁর বাইরের ঘরে আধুনিক কায়দার আসবাবপত্র নেই। ঘরের মাঝখানটাতে পুরু একটা গদি পাতা আছে। এক পাশে খানকতক চেয়ার। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, হাল ফ্যাশানের আদবকায়দা এখনও এ-বাড়িতে প্রবেশ করে নি।

ঘরখানি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেই পুরনো কায়দার বেলোয়ারী বাতি ঝুলছে। দেওয়ালের গায়ে একটা মস্তবড়ো সিন্দুক। দেওয়াল কেটে সিন্দুকটাকে সযত্নে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেটার গায়ে লাল সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা। আর তার গায়ে সিঁদুর দিয়েই লেখা রয়েছে— ৺শ্রীশ্রীকালীমাতার সহায় এই কারবার করিতেছি। সন............

দেওয়ালের চারি দিকে অসংখ্য দেবদেবতা এবং দেশনেতাদের ছবি। নারায়ণ, গণেশ, মা কালী, শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে বাল-গঙ্গাধর তিলক, সি আর দাশ, গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত নেহেরু কেউ বাদ যায় নি।

যে ভদ্রলোক সুনীলেশকে পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একটু বাদেই ফিরে এসে বললেন, স্যার, বসুন। কর্তামা পুজোয় বসেছেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই আসছেন। বড়ো কর্তা বাইরে গেছেন। ফিরতে এখনও দু-চারদিন দেরি হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই একজন পাচক ঠাকুর শ্বেত পাথরের থালায় করে ফলমূল আর মিষ্টি নিয়ে ঢুকল।

সুনীলেশ ততক্ষণে গদির ওপরে তাকিয়া হেলান দিয়ে চোখ

বুজে বসেছে। বার বার শুধু ওর মনে হতে লাগল, মাধবী পুজো সেই ঘর বারান্দায় থাম দাঁড়িয়ে
মাধবী বিয়ের মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই সন্ধ্যেবেলা পুজো করতে বসছে! ধূপ ধুনো চন্দন আর চরণামৃতের গন্ধের মাঝখান থেকে মাধবীর জীবনের এক চরম ট্র্যাজেডি সুনীলেশের কাছে ধরা পড়ল।

খাবারের থালা তেমনিই পড়ে রইল। পাচক ঠাকুর আর কাঠগোলার কর্মচারী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুনীলেশ তখন মনশ্চক্ষু দিয়ে মাধবীকে দেখছিল। শুচিস্নাতা গৈরিকবসনা এক যুবতী ধ্যানরতা হয়ে দেবতার কাছে হয়তো বা কোনো বর প্রার্থনা করছে।

মাধবীর ডাকে সুনীলেশ চোখ খুলল। ঘরে ঢুকেই মাধবী বলল, একি সুনীলেশদা, খাবারগুলো পড়ে রয়েছে, এখনও খান নি কেন? কি আশ্চর্য!

সুনীলেশ মাধবীর দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার খিধে নেই মাধবী।

মাধবী বুঝল, সুনীলেশ খাবে না। ঠাকুরকে ডেকে খাবারের থালা সরিয়ে নিতে বলে শুধু এক কাপ চা দিয়ে যেতে বলল। তারপর সুনীলেশের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, সুনীলেশদা, মাধবী কেমন আছে বলে মনে হয়?

—ভালো আছে বলেই তো মনে হচ্ছে!

মাধবী গদির এক কোণে বসল। তারপর আস্তে আস্তে স্বামীর বিত্ত এবং বৈভবের কথা সুনীলেশকে বলল। বিরাট ধনী, কলকাতায় পাঁচখানা বাড়ি রয়েছে। গাড়ি রয়েছে খানতিনেক। বিলাসপুরে প্রকাণ্ড বন ইজারা নেওয়া হয়েছে। আশুতোষবাবু মাসের মধ্যে পনেরো দিন বিলাসপুরেই থাকেন।

—তাহলে তোমার সুখের কোনও অভাব নেই। সুনীলেশ বলল।

—না, বলে মাধবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সুনীলেশ বলল, চমৎকার, সত্যিই শুনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু হঠাৎ এত ধার্মিক হয়ে উঠলে কবে থেকে ?

মাধবী বলল, আমার স্বামীও খুব ধার্মিক। তিনি নিজেও সকাল বিকাল চার ঘণ্টা ঠাকুরঘরে থাকেন। দেখলাম জিনিসটা ভাল। মনে শান্তি আসে। তাই আমিও শুরু করেছি। আর তাছাড়া আমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী—তাঁর যা ভালো লাগে, আমারও তা করা উচিত। সত্যি কিনা বলুন ?

সুনীলেশ কথা বলল না। শুধু মাথা নেড়ে মাধবীর কথায় সায় দিল।

মাধবী এইবার তার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, সুনীলেশদা, বিয়ের রাত্রেই টের পেয়েছিলাম, আমি যা চেয়েছিলাম, তাছাড়া আর সবই পেয়েছি।

সুনীলেশকে চুপ করে থাকতে দেখে মাধবী আবার বলল, আমি মূর্খ, লেখাপড়া শিখি নি ; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অর্থ কখনও চাই নি—গয়না চাই নি, মোটর গাড়িও চাই নি। আমি শুধু স্বামী চেয়েছিলাম।

সুনীলেশ বলল, স্বামী তো পেয়েছে।

—খুউউব ভালো স্বামী। মাধবী বলল, অস্বীকার করব না, অস্বীকার করলে আমার মহা পাপ হবে। এমন ভালো স্বামী খুব কম মেয়ের ভাগ্যে জোটে।

—কি রকম শুনি ? সুনীলেশ প্রশ্ন করল।

মাধবী বলল, এমন গুণ নেই, যা আমার স্বামীর নেই ! অর্থবান, ভদ্র, ধার্মিক, পরোপকারী। পঞ্চাশ জন কর্মচারী রয়েছে ব্যবসায়ে। সবাইকে নিজের ছেলের মতো দেখেন। কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হলে সমস্ত খরচ নিজে বহন করেন। বারো মাসে তেরো পার্বন তো লেগেই রয়েছে।

—এ তো ভাগ্যের কথা, সুনীলেশ বলল।

—সত্যিই তাই। আপনার সঙ্গে আজ ওঁর দেখা হল না, আর একদিন এলে দেখা হবে। দয়া করে আসবার আগে একটা ফোন করে আসবেন। উনি প্রায়ই বাইরে থাকেন কিনা, তাই।

সুনীলেশ চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময়ে মাধবী হঠাৎ বলল, সুনীলেশদা আপনি আমার এখানে থাকুন না! দোতলার দুটো ঘর আপনাকে ছেড়ে দেব। আমি নিজে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। তদারক করবার জন্যে বিদ্যাধরদা তো রইলই।

সুনীলেশ ততক্ষণে প্রায় উঠে পড়েছে। ওর যেন কেবলি মনে হচ্ছিল বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে আজও দরিদ্র পিতামাতার কন্যাদের হাত-পা বেঁধে অজ্ঞাতবাস করতে পাঠানো হয়।

কিন্তু মাধবী নাছোড়বান্দা। ওর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাই একটুখানি চুপ করে থেকে সুনীলেশ বলল, কিন্তু তোমার স্বামী আপত্তি করবেন না তো?

মাধবী এবার হেসে উঠল। তারপর গায়ের আঁচলটা টানতে টানতে বলল, আমার স্বামী আমায় যা দিতে পারেন নি, তা অন্য জিনিস দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে গুটি তিনেক বাড়ি আমার নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয়েছে।

সুনীলেশ একটু বিরক্তির স্বরে বলল, মাত্র কয়েক মাস হল বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে সব ম্যানেজ করে নিয়েছ? বেশ করিতকর্মা মেয়ে তো তুমি!

মাধবী এবার গম্ভীর হল। ও বুঝতে পারল, সুনীলেশের মনে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

সুনীলেশের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ওর সমস্ত মনুষ্যত্বকে নাড়া দিল। ও বলল, সুনীলেশদা, আমাকে আপনার কিরকম মেয়ে বলে মনে হয়? আমি কি সত্যিই এত নীচ?

সুনীলেশ লজ্জা পেল। বলল, না, না, তুমি কদর্থ করছ কেন

মাধবী? কথাটা তোমায় ঠাট্টা করে বলেছি। তোমার স্বামী তোমার নামে বাড়ি রেজিস্ট্রি করে দিলে তোমার তাতে বলবার কি আছে?

তবুও মাধবী সহজ হতে পারল না। বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই চাই নি। যে জিনিস প্রথম যৌবনে স্বামীর কাছে মেয়েরা চায়, আমি তাও চাই নি। শুধু মাত্র আশা করেছিলাম, আমি তা থেকে বঞ্চিত হব না। আমার স্বামী বিয়ের দু-মাস পরে আমার নামে তিনখানা বাড়ি লিখে দিয়েছেন। বলতে পারেন, আমি আপত্তি করলাম না কেন? আমি তো কিছুতেই আপত্তি করি নি সুনীলেশদা। মামাবাবু বিয়ের আগে যখন এসে বললেন, দ্বিতীয় পক্ষ, বয়েস বেশি। আমি তখনও কোনও আপত্তি করি নি। এ ব্যাপারে আপত্তি জানাবার কোনও অধিকারই আমার ছিল না। এক ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন, এই তো বেশি।

সুনীলেশ কথাটা ঘুরিয়ে বলল, থাক্ এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও মাধবী। আমি শুধু বলছিলাম, আমি তোমার বাড়িতে থাকলে আশুতোষবাবু অসন্তুষ্ট হতে পারেন তো?

—হবেন না, আমি জানি বলেই বলছি।

—কারণ? সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল।

—কারণ, আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া ওর আর গত্যন্তর নেই। বাড়ির সিন্দুকের চাবি হাতে তুলে দিয়ে, সম্পত্তি লিখে দিয়ে এবং আমাকে গৃহিণীর আসনে বসিয়ে দিয়ে উনি শুধু একটি কথাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন।

সুনীলেশ ফোড়ন কেটে বলল, এবং তিনি চান যে তুমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবে না, এই তো?

তারপর মাধবী উত্তর দেবার আগেই সুনীলেশ উঠে পড়ল। বলল, একবার কাগজের আপিসে যেতে হবে। আর বসবার উপায় নেই।

মাধবী এবার আর বাধা দিল না।

অধ্যাপক মুরারি ঘোষ বসে নেই। সুনীলেশের পর ইতিমধ্যে সুধেন্দুবাবু এবং সুশান্ত বসুর কাছে তাঁর লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে।

সুশান্তর সঙ্গে ওঁর আলাপ কি করে হল, তা সুনীলেশ জানত না। একদিন সুশান্তই ব্যাপারটা খুলে বললেন। সুনীলেশ অবাক হয়ে গেল। মুরারি ঘোষ এবং ওঁর সেই Society for the Protection of Cultural Unity of India এমন নিখুঁত ভাবে সব লোক পাকড়াও করছে, যে ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। শচীন্দ্রনাথের কাগজে যোগদান করবার এক মাসের মধ্যেই নাকি মুরারি ঘোষ সুশান্তর সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করেন। একদিন 'নূতন দিগন্ত'-র আপিসেও সুশান্ত ঘুরে এসেছেন।

সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে সুশান্ত পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে সুনীলেশের হাতে দিলেন। চিঠিখানা লিখেছেন অধ্যাপক মুরারি ঘোষ। অনুরোধ করেছেন, নূতন কলকাতা গড়বার প্ল্যানটার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখলে বড়োই ভালো হয়। একদিন যদি ওঁদের আপিসে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, তবে অধ্যাপক এবং ওঁর বন্ধুরা খুবই আনন্দিত হবেন।

সুনীলেশ বলল, চলুন একদিন ঘুরে আসি।

সুশান্ত বললেন, দৈনিক কাগজগুলো সুর পালটাল, শচীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হার মানলেন, অথচ মুরারি ঘোষ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, কল্পনা করতে পারেন?

সুনীলেশ বলল, এটা হচ্ছে একটা প্রচারের কায়দা। মুরারিবাবু জানেন, মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল; আর তাছাড়া আমাদের দেশে উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী। দু-মাস আগে কলকাতার কাগজগুলো কলকাতাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এখন সমস্যাটার

চারিদিকে বিস্মৃতির ঘন কুয়াশাজাল বিস্তার করেছে। আরও দু-মাস পরে এই কুয়াশা অন্ধকারে রূপান্তরিত হবে। তখন আস্তে আস্তে মুরারিবাবুরা মৃদু গুঞ্জনের সুরে নতুন কলকাতার গান গাইবেন। প্রথম-প্রথম কেউ-কেউ প্রতিবাদ করে বলবেন, বড্ড বেসুরো লাগছে তো? তারপর মৃদু প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন আরও সুযোগ আসবে, আরও গভীর অনুপ্রবেশ করা যাবে মানুষের মনে। দীর্ঘ চেষ্টার ফলে হয়তো কলকাতার সমস্যাপীড়িত লোকরা বলবে— হ'ক যা খুশি তাই— আর ভালো লাগছে না।

মুরারি ঘোষদের Society ঠিক এই অনুপ্রবেশ নীতি গ্রহণ করেছে। প্রথমে কয়েকজন নূতন কলকাতার সমর্থকদের নিয়ে একটা সভা হল। দৈনিক কাগজে ছোট্ট করে একটা খবর বেরুল। তারপর সভাটা আরও একটু বড়ো করে করা হল। খবরটা আরও একটু বড়ো করে ছাপা হল। কিছুদিন বাদে একটা হল ভাড়া করে সভা করা হল। একজন নামকরা ভদ্রলোককে সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ করা হল। তিনি অন্য কোনও ব্যাপারেই Society-র কর্মপন্থা সমর্থন করেন না— তবে কলকাতা শহরটাকে ঢেলে নূতন করে সাজানোর ব্যাপারটা সমর্থন করেন, তাই সভাপতি হতে রাজী হলেন। সে-সভায় মুরারিবাবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা আরও একটু উচ্চকণ্ঠে নূতন কলকাতার প্ল্যান ঘোষণা করলেন। তাঁরা বললেন, যাঁরা নূতন কলকাতাকে সমর্থন করেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে শহরটাকে ভালোবাসেন।

এবার দু-কলাম হেড লাইনে খবর এবং সভার ফটো ছাপা হল।

সেইজন্যেই সুনীলেশ বলছিল, মুরারি ঘোষদের প্রচারের কায়দা আছে। ওরা একটা জিনিসে বিশ্বাস করেন, মানুষের ধৈর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বেশির ভাগ লোক বিরক্ত হয়ে স্থান ছেড়ে পালিয়ে যাবে, কিংবা বলবে— বাবা, কানেস্তারা পিটিও না— কি চাও, দিচ্ছি।

ঐ সপ্তাহেই একদিন সুশান্ত সুনীলেশকে সঙ্গে করে নূতন দিগন্তের আপিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যথারীতি আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হবার পর অধ্যাপক ঘোষ সুশান্তকে নূতন কলকাতার ওপর একটা লেখা দিতে বললেন।

সুশান্ত বললেন, অধ্যাপক, আমি নূতন কলকাতার সমর্থক নই। আমার লেখায় আপনার সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে বেশি।

মুরারি ঘোষ বিপদে পড়লেন। সুনীলেশ ঘোষ তবুও কথা বলার সুযোগ দেয়, সুশান্ত বসু আরও বলিষ্ঠ এবং স্পষ্টবাদী। একে খেলিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তিনিও কম চতুর নন। তিনি বললেন, কলকাতাটাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজালে আপনার আপত্তি কি সুশান্তবাবু?

সুশান্ত বললেন, আপত্তি হচ্ছে এই যে, সে-কলকাতায় আমাদের মতো দুশো-আড়াই শো টাকার চুনোপুঁটিদের জায়গা হবে না।

মাঝখানে সুনীলেশ একটু চিমটি কাটল। বলল, অধ্যাপক, আপনি বোধহয় জানেন না যে এরই মধ্যে গুটিকয়েক লিমিটেড কোম্পানি Float করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকটার Capital দু-কোটি টাকার ওপর। এরা জমি নিয়ে ব্যবসা করবে।

মুরারি ঘোষ বললেন, জমি নিয়ে যাতে ব্যবসা করা না যায়, তার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

সুশান্ত বললেন, কিন্তু অধ্যাপক, আপনি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের কৃষ্টিরক্ষক সমিতির একজন সভ্য। এই জব চার্ণকের শহরটাকে ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেবার আন্দোলনে আপনার যোগ দেওয়া উচিত নয়। আপনি কৃষ্টির বাহক। কৃষ্টি আজকের সৃষ্টি নয়। শত সহস্র বৎসর ধরে চিন্তা, ভাবনা এবং জীবনধারার যে স্রোত বয়ে আসছে, তার কিছুটাও যদি ধরে রাখা যায়, তাহলেও আমাদের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। দেখেছেন তো, পাঁচশো বছর আগেকার একটা oil painting পাঁচ লাখ টাকায়

বিক্রি হয়? এর মানে এই নয় যে আজকের শিল্পী ওর চাইতে ভালো আঁকতে পারেন না। অতীতকে ধরে রাখবার romance ভয়ানক মূল্যবান। এঁদো গলির কলকাতা, কালীঘাটের কলকাতা, মিছিলের কলকতা, দারিদ্র্য আর অনশনের কলকাতা বাঁচুক না, যদ্দিন বাঁচে! তারপর যেদিন কলকাতার আশেপাশে আরও মহানগরীর সৃষ্টি হবে, তখন সেই নূতন মহানগরীর লোকরা সব আসবে পুরনো কলকাতা দেখতে। সেদিন হবে পুরনো কলকাতায় নূতন কলকাতাবাসীদের তীর্থযাত্রা।

মুরারি ঘোষ চুপ করে রইলেন। তিনি সুশান্ত বসুকে নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। অথচ এই পণ্ডিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা লেখা নিতে পারলে সত্যিই খুব কাজ হত!

আসবার আগে মুরারি ঘোষ ওদের দুখানা 'নূতন দিগন্ত' দিয়ে দিলেন। রাস্তায় আসতে আসতে সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, এলাহাবাদ থাকতে একখানা ইতিহাসের মাসিক পত্রিকা বের করেছিলাম। গোটাছয়েক সংখ্যার পরই বন্ধ করে দিতে হল। বলতে কি, উষার সাহায্য না পেলে সম্ভব হত না। ছটা সংখায় কমপক্ষে ছ হাজার টাকা লোকসান হয়েছিল। একটা বিজ্ঞাপনও পাই নি। হেন কোম্পানি নেই যাদের কাছে বিজ্ঞাপনের জন্যে চিঠি লিখি নি। কিন্তু বিজ্ঞাপন তো দূরের কথা, দু-একটা কোম্পানি ছাড়া কেউ উত্তরই দিলে না।

সুনীলেশ মুচকি হেসে বলল, কিন্তু অধ্যাপক মুরারি ঘোষ সেদিক থেকে খুব ভাগ্যবান। আজকাল কলকাতা শহরে কাগজ দেখে কেউ বিজ্ঞাপন দেয় না। কাগজ কে চালায়, কাগজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কি, এই সব দেখে তারপর বিজ্ঞাপন আসে। আপনার ইতিহাসের পত্রিকায় দুর্বোধ্য অতীতকে নিয়ে সব লেখা বেরুত। ওসব কাগজ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতাদের আজকাল কোনও interest নেই।

সুশান্ত বললেন, বেচারা উষা! ওর ছ'হাজার টাকা মাঠে মারা গেছে। ওকে অবিশ্যি আমি বলেছি, রোজগার বাড়লে ওর টাকাটা আস্তে আস্তে শোধ দিয়ে দেব। কিন্তু সুনীলেশবাবু, পারব কি কখনও আর উষার ঋণ শোধ করতে?

মুরারি ঘোষদের প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতের কৃষ্টি রক্ষাই করছেন না, নানারকম উদ্ভট খবর পাঠাচ্ছেন কলকাতার কাগজগুলিতে। সুনীলেশ খবর পেল ওদের একটা খবর সরবরাহের প্রতিষ্ঠানও আছে। ছোটো প্রতিষ্ঠান, কিন্তু মূল্যবান খবর সরবরাহে ইতিমধ্যেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সাধারণতঃ এঁরা বিদেশের বহু গোপন খবর দিয়ে থাকেন, যে-সমস্ত খবরের খোঁজ অন্যান্য সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি রাখে না। দেশের খবরও এঁরা দেন, তবে সেগুলো হচ্ছে Back-grounder অর্থাৎ অত্যন্ত গোপন ধরনের খবর। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর। এইসব খবরের পেছনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিত থাকে। সব চাইতে মজা, এই প্রতিষ্ঠানের খবরের জন্যে কাগজের মালিকদের কোনও পয়সা দিতে হয় না—শুধু মাত্র ছাপলেই হল।

শচীন্দ্রনাথ এইসব খবর কিছু কিছু ছাপবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর কাগজের নিউজ এডিটর এবং সাব-এডিটররা প্রথম প্রথম খবরগুলোকে চেপে যেতেন। মুরারি ঘোষ টেলিফোন করে অনুসন্ধান করলে নিউজ ডিপার্টমেন্ট বলত, জায়গা নেই, আচ্ছা দেখব, ইত্যাদি। কিন্তু ওরা জানত না যে শচীন্দ্রনাথও আস্তে আস্তে মুরারি ঘোষদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। অবিশ্যি এমনিতে নয়। ওদের খবর ছাপলে, অন্যদিক থেকে অনেক লাভ হয়। বিজ্ঞাপন ছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষ ধরনের ক্রোড়পত্র ছাপবার সুযোগ পাওয়া যায়।

কলকাতার অন্যান্য কাগজগুলিও আস্তে আস্তে মুরারি ঘোষদের খবর ছাপতে শুরু করল। এ ব্যাপারেও মুরারি ঘোষদের Society-র সেই পুরাতন পন্থা। একই জিনিস নিয়ে নানা কায়দায় খবর

পরিবেশন করে মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করা। প্রথমদিকে কাগজের অনাদৃত কলামে ছোট্ট করে একটি খবর বেরোয়। তারপরে খবরগুলির আভিজাত্য বাড়তে থাকে। বড়ো বড়ো হেড লাইন দিয়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। পাঠকেরা গোড়ার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে যায়। কোনও গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ক্রমাগত খবরগুলো এমন আকার ধারণ করতে থাকে যে গুরুত্ব না দিয়ে আর পারা যায় না। আপিসে, ট্রামে-বাসে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। অবিশ্বাস্য এবং আজগুবি খবর সত্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে কুৎসা রচনা চলে, তারা অকারণ বাদবিসংবাদের মধ্যে যেতে চায় না। কিন্তু একদিন দলের সভ্যদের মধ্যে পর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যারা দলকে সমর্থন করে, তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এ সব কি সত্যি ?

শচীন্দ্রনাথ একদিন সুনীলেশকে ডেকে এক প্রতিবেশী-রাজ্যের সম্বন্ধে একটা বিশেষ রিপোর্ট লিখতে বললেন।

সুনীলেশ বলল, স্যার, লিখব কি করে ? তথ্য পাই কোথা ?

—কত তথ্য চাই ? বলে শচীন্দ্রনাথ এক বাণ্ডিল ছাপানো কাগজ এবং দুখানা বই বের করে সুনীলেশের হাতে দিলেন।

সুনীলেশ পড়ে দেখল, কাগজগুলো Society for the Protection of Cultural Unity of India ছেপেছে। বই দুখানা বিদেশে ছাপা। একটুখানি উলটে পালটে দেখে সুনীলেশ বলল, কিন্তু এ-সব তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে। এ নিয়ে কিছু লেখা কাগজের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। আর তাছাড়া আপনি যা লিখতে বলেছেন, তা লিখতে গেলে, দেশের অনেক কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লিখতে হয়।

সুনীলেশের কথা শুনে শচীন্দ্রনাথ অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর ভারিক্কি চালে বললেন, সুনীলেশ, খবরের কাগজকে অনেক

গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রয়োজনবোধে যাঁরা গদিতে বসে রয়েছেন, তাঁদের টেনে নামানোর জন্যে প্রচার চালাতে হয়। তুমি আমার কাগজের ঐতিহ্য তো জান! ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে আমাদের কাগজের জন্ম। ইংরেজের বিরুদ্ধে লিখে আমার পিতৃদেব বহুবার কারাবরণ করেছেন।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা এখন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি। যাঁরা দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছেন, তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করেন, তাহলে তাঁদের ঠিকপথে চালানোর দায়িত্ব কাগজওয়ালাদের। কাগজকে তুমি ডেমোক্র্যাসির watch dog বলতে পারো। আমরা যদি একটু ঢিলে দি, তাহলে দেশ রসাতলে যাবে।

সুনীলেশ বলল, স্যার, সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনার খবরগুলোর মধ্যে এমন সব গোপন তথ্য রয়েছে, যেগুলো ছাপলে কর্তৃপক্ষ আপনাকে বেকায়দায় ফেলতে পারেন।

শচীন্দ্রনাথ আবার হেসে বললেন, সুনীলেশ, এ-সব কথা বলবার আগে দেশের constitution-টা একটু ভালো করে দেখে নিও। constitution-এ ২২৬ অনুচ্ছেদ রয়েছে কি করতে? হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? কাগজের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে, এমন ক্ষমতা কারুরই নেই!

ঘর থেকে বেরুবার আগে সুনীলেশের পিঠ চাপড়ে শচীন্দ্রনাথ বললেন, ঘাবড়াও ম্যৎ, তোমাকে তো বলেছি সুনীলেশ, তোমার গোঁড়া principleগুলোকে একটুখানি elastic কর। আর তা ছাড়া তুমি চাকরি করছ। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম!

বিষণ্ণ বদনে আপিসে ফিরে আসতেই বিনয় সেন বললেন, ব্যাপার কি বন্ধু, এমন বিরস বদন কেন?

সুনীলেশ বলল, এদ্দিন কেবল flirt করে বেরিয়েছি, কিন্তু আজ বুঝি খাতায় নাম লেখাতে হয়।

বিনয় সেন বললেন, রোজ আসবার আগে বিবেক বলে যে বস্তুটা আছে তাকে বাক্সে পুরে রেখে এস। ভালো করে কাজ করতে পারবে।

সুনীলেশ মলিন হাসি হেসে কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে নিজের চেয়ারে গুম্ হয়ে বসে রইল। যে-সব খবরগুলিকে ভুল, বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত বলে পৃথিবীর সব সুস্থ লোকরা জানে, সেইগুলিকে নিয়ে জলজ্যান্ত মিথ্যে লেখা দাঁড করানোর মতো বেদনাদায়ক একটা কাজ করতে ওর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

রাত্রি ন'টা নাগাদ সেই বিকৃত তথ্যগুলো দিয়ে সুনীলেশ একটা লেখা প্রায় দাঁড় করিয়েছে, এমন সময়ে শচীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এক জরুরী তলব এসে উপস্থিত হল। সুনীলেশের ততক্ষণে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। আর এক বাণ্ডিল কাগজপত্র দেবার জন্যে শচীন্দ্রনাথ ডাকেন নি তো?

ভীরু প্রকম্পিত পদক্ষেপে সুনীলেশ শচীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, সুনীলেশ, লেখাটা বদলে দিতে হবে।

সুনীলেশের মুখে শব্দ নেই, ও ভাবল, আবার কি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটল, যার জন্যে লেখাটার পরিবর্তন প্রয়োজন হল।

শচীন্দ্রনাথই আবার বলেন, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই সত্যি। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এখন কিছু লেখা ঠিক হবে না।

সুনীলেশের গা থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শচীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করছেন না তো? ও বলল, স্যার, আপনি বলছেন কি? আমি যে···

—হ্যাঁ, জানি— তুমি লেখাটা প্রায় শেষ করে এনেছিলে। সময় নেই। রাত্রি একটা বাজলেও অন্য একটা লেখা লিখে দিতেই হবে। কালকের কাগজে বেরুনো চাই।

সুনীলেশ পুলকিত চিত্তে বেরিয়ে আসতেই বিনয় সেন বললেন, এ যাত্রাও রক্ষা পেলে তাহলে?

সুনীলেশ সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলতেই বিনয় সেন বললেন,

Advertising department-এ খবর নিয়ে দেখ গে, কোনও বিশেষ জায়গা থেকে মোটা বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্ট এসে গেছে।

শচীন্দ্রনাথের সেই কথাটা সুনীলেশের মনে পড়ল— "দুটো পয়সা রোজগার করা ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।"

সুধেন্দুবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুদিন সুনীলেশের দেখা হয় নি। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় সুধেন্দুবাবুর বাড়িতেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

প্রকাশক-কোম্পানির চাকরিটাতে সুধেন্দুবাবু বেশ ভালোভাবেই বহাল হয়েছিলেন। পার্টটাইম কাজ— মাইনেও কম, কিন্তু তবুও মালিক সুধেন্দুবাবুকে বেশ সমীহ করে চলতেন। প্রথম প্রথম ওঁকে নিয়ে যে তাঁর অসুবিধে হয় নি, তা নয়। কিন্তু এখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সব চেয়ে মুশকিল হত যখন কোনও লেখকের সামনে সুধেন্দুবাবু পাণ্ডুলিপি পড়ে মন্তব্য প্রকাশ করতেন। সেকেলে লোক, কোনও বিচ্যুতি হবার উপায় নেই। একটা বানান ভুল চোখে পড়লে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন। প্রকাশক ভদ্রলোক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে ওঁকে বাগে আনতে পেরেছেন।

বিকেলবেলা প্রকাশকের আপিস থেকে সুনীলেশের কাছে টেলিফোন এল। প্রকাশক বললেন, তিনচার দিন সুধেন্দুবাবুর পাত্তা নেই। আপিসে আসছেন না। সাধারণতঃ তিনি কখনও এমনটি করেন না। যদি না আসতে পারেন, আগেই খবর পাঠিয়ে দেন।

সুনীলেশ চিন্তিত হল। সহজ সরল মানুষদের গতিবিধিতে কোনও ব্যতিক্রম ঘটলেও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দু-একজায়গায় টেলিফোন করে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেও কোনও ফল হল না। সবাই একই কথা বলল, কয়েকদিন হয় সুধেন্দুবাবু আসছেন না। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুনীলেশের মনে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনাল। সুধেন্দুদার স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছিল না।

কিন্তু বিপদটা এল অন্য দিক থেকে। সুনীলেশ কেন, কেউই তা কল্পনা করতে পারে নি।

যেদিন প্রকাশক ভদ্রলোক টেলিফোন করলেন, সেইদিনই রাত্রি এগারোটা নাগাদ সুধেন্দুবাবু সুনীলেশের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। ওঁর চেহারা দেখেই সুনীলেশ বুঝতে পারল, একটা কিছু ঘটেছে। কিছু বলবার আগেই সুধেন্দুবাবু ধপ্ করে ওর তক্তপোষের ওপর বসে কাঁদতে লাগলেন। সুনীলেশ দু-হাত দিয়ে সুধেন্দুবাবুকে জাপটে ধরে বলল, বউদির কিছু হয় নি তো?

সুধেন্দুবাবু মিনিট কয়েক ধরে নিষ্পলক নেত্রে সুনীলেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর শরীরটা ততক্ষণে শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছে।

সুনীলেশ বলল, সুধেন্দুদা, কি হয়েছে বলুন, আমার কাছে বলতে আপনার বাধা কি! বলুন।

সুধেন্দুবাবু বেদনাহত স্বরে আস্তে আস্তে বললেন, সুনীলেশ, মানুষের মৃত্যু কতরকমের হয় বলতে পার?

—কিছু বুঝতে পারছি না সুধেন্দুদা, আপনি আসল কথাটা বলছেন না কেন? হয়েছে কি?

এইবার সুধেন্দুবাবু আস্তে আস্তে বললেন, কুন্তী সন্তানসম্ভবা।

এক সেকেণ্ডের মধ্যে সুনীলেশের সারা দেহের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর গলা শুকিয়ে এল। এইবার কি ও সুধেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবে, কুন্তীর সন্তানের পিতা কে? একথা সুধেন্দুদাকে জিজ্ঞেস করবার মতো সাহস ও তখনো সঞ্চয় করতে পারছিল না।

সুধেন্দুবাবু তখনো দু-হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে রয়েছেন। যেন কুন্তীর জীবনের সমস্ত লজ্জা ওঁর চোখে নেমে এসেছে।

সুনীলেশ সাহস সঞ্চয় করল। যত বড়ো বিপদই আসুক, সবাইকেই তার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়। এড়িয়ে যেতে চাইলেও বিপদকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দু-হাত দিয়ে সুধেন্দুবাবুর হাত-

দুটো চোখ থেকে টেনে নামিয়ে সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল, সুধেন্দুদা, এ সম্ভব হল কি করে? কে এ-কাজ করেছে?

সুধেন্দুবাবু তখনও কিন্তু সুনীলেশের চোখের দিকে চাইতে পারছিলেন না। খানিকক্ষণ পরে চোখদুটোকে নিচু করে বললেন, এখনও জানতে পারি নি। মাত্র তিনদিন আগে কুন্তীর মা ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন। কুন্তী কোনো কথাই বলছে না।

সুনীলেশ বলল, কিন্তু না বললে চলবে কেন? সেই বীরপুরুষটিকে অবিলম্বে বের করে তার সঙ্গে কুন্তীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যে। কুন্তীকে এ-কথা বলতেই হবে।

সুধেন্দুবাবু থেকে থেকে দু-এক মিনিট পর পরই শুধু বলছিলেন, আমার কী সর্বনাশ হল, কী সর্বনাশ হল।

সুনীলেশ অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল, সুধেন্দুদা, সর্বনাশ আপনার যতখানি না হয়েছে, তার চাইতেও সহস্রগুণ বেশি হয়েছে আপনার কন্যার। একটা কোনও ব্যবস্থা করতে না পারলে, ওর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল বলে।

সুধেন্দুবাবু এইবার চোখ তুলে সুনীলেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এর চাইতে কুন্তীর মৃত্যু হলে আমি সুখী হতাম। আজও এই মুহূর্তে আমি ওর মৃত্যু কামনা করছি। সুনীলেশ, তুমি যদি ওর মায়ের অবস্থা দেখতে তাহলে বুঝতে কুন্তী আমাদের কি সর্বনাশ করেছে। ও তো জাহান্নামে গেছেই, ওর মাকেও আর বাঁচানো যাবে বলে মনে হয় না। এছাড়াও কুন্তীর ছোটো ভাইবোনরা রয়েছে। আমি কি করব, বলতে পার? তোমাকে একবার আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। তোমার বউদিদির অনুরোধ। যদি তুমি কুন্তীর কাছ থেকে খবরটা বের করতে পার।

পরের দিন ভোর না হতেই সুনীলেশ সুধেন্দুবাবুর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সুধেন্দুবাবু তৈরি হয়েই ছিলেন। ওকে নিয়ে গেলেন শয্যাশায়ী স্ত্রীর কাছে। তিনজনে মিলে কথা হল অনেক।

সবারই এক কথা— যা হবার তা তো হয়েছে। এখন মুখরক্ষা করবার উপায় কি? সুধেন্দুবাবুর স্ত্রী কিন্তু সুধেন্দুবাবুর মতো অতটা ভেঙে পড়েন নি। তিনি অনেক বেশি বাস্তববাদী এবং দৃঢ়প্রত্যয়শালিনী। সুনীলেশকে তিনি বললেন, মেয়েদের সময়মতো বিয়ে না দিলে কেলেঙ্কারি যে হতে পারে আপনার দাদা এই প্রথমবার জীবনে প্রত্যক্ষ করলেন। তবে মুশকিল হচ্ছে, অভিজ্ঞতাটা নিজের কন্যার ওপর দিয়ে হল বলে বড়ো বেশি তিক্ত হল। উপায় কিছু নেই। দেখুন ভাই সুনীলেশবাবু, যদি আপনি কিছু সুরাহা করতে পারেন; আমি তো কুন্তীর কাছ থেকে কোনও খবরই বের করতে পারি নি।

কুন্তী একটা ঘরে চুপ করে বসে ছিল। সুনীলেশকে নিয়ে সুধেন্দুবাবু সেই ঘরে গেলেন। তারপর কম্পিতকণ্ঠে বললেন, কুন্তী, সুনীলেশ তোর সঙ্গে একটু কথা বলবে। তোর পায়ে পড়ি, যা বলবার ওকে বল্।

কুন্তী তখনও মাথা নিচু করে বসে। ভোরের প্রথম সূর্যালোক পাশের বাড়ির একটা নিমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সেই এঁদোগলির অন্ধকার বাড়ির মধ্যে তখন সবে প্রবেশ করেছে। কুন্তী মাথা নিচু করে একটা শতরঞ্চির ওপর বসে নখ খুঁটছিল। সুধেন্দুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুনীলেশ বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বলল, কুন্তীদেবী, যা হবার তা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একটুখানি খুলে বলুন। বুঝতেই তো পারছেন, সেই বীরপুরুষটির পাত্তা করতে না পারলে, কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবে না।

এইবার কুন্তী মাথা তুলে সুনীলেশের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টি ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এলোমেলো চুলের গুচ্ছ সেদিনও ওর মুখটাকে ঢেকে রেখেছিল, তার মধ্যে থেকে দুটো চোখ সুনীলেশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুনীলেশ নিশ্বাসটা প্রায় বন্ধ করে মিনিটখানেক বসে রইল, শুধু একটা নাম শোনবার জন্যে।

হঠাৎ কুন্তী চেঁচিয়ে বলল, তাঁর নাম আমি বলব না।

সুনীলেশের ততক্ষণে সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। ও বলল, কুন্তীদেবী, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ব্যাপারটার গুরুত্ব কি কিছুই বুঝতে পারছেন না? Don't be silly, বলুন।

কুন্তী খানিকটা আত্মস্থ হয়ে নিয়ে জবাব দিল, সবই বুঝতে পারি, কিন্তু যাঁকে ভালবেসেছি তাঁকে আমি বিপদে ফেলতে পারব না।

সুনীলেশের ততক্ষণে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার অবস্থা। গীতা, চণ্ডী, শনি আর লক্ষ্মীর পাঁচালী-পড়া কুন্তীর জীবনোদ্যানে প্রেমের ভ্রমর গুঞ্জন করতে করতে মধু আহরণ কররার জন্যে উড়ে এসেছিল। মধু আহরণ করে সে আবার উড়ে চলে গেছে। সুনীলেশ বুঝতে পারছিল, কুন্তীর যৌবনের কূলে কামনার ঢেউগুলি এসে আঘাত করতে করতে, একদিন অসতর্ক মুহূর্তে জীবনের পাড় ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে ওর কোনও দুঃখ নেই, নেই কোনও আপশোষ। সেই কবে ওর জীবনে যখন যৌবনের ফুল ফুটেছিল, তখন থেকে ও অপেক্ষা করছিল কোনও এক শুভলগ্নের জন্যে, যে লগ্নে নিজেকে অন্য একজনের কাছে হারিয়ে দিয়ে চরম শান্তি লাভ করা যায়। সে লগ্ন এল না। বহুদিন ও কান পেতে ছিল, সেই কূলভাঙ্গা প্রাণের ঢেউ এসে কবে জীবনের প্রান্তে আঘাত হানবে। কিন্তু পিতার অসামর্থ্যের জন্য ঢেউগুলি বারবার এসে ফিরে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে ঢেউএর আঘাতগুলি জীবনের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ কেটে রেখেছিল। তারপর মাত্র একটা বিরাট ঢেউএর ধাক্কায় তাল সামলাতে না পেরে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে একসঙ্গে ধ্বসে পড়ে গেছে!

মিনিটপাঁচেক চুপ করে বসে থেকে সুনীলেশ বলল, কিন্তু কুন্তীদেবী, যে ভদ্রলোক আপনার শিশুর পিতা হবেন, তাঁর সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা না করতে পারলে, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন কি?

কুন্তী উত্তর দিল, দেখেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া

সম্ভব নয়। তিনি বিবাহিত। সংসার আছে। ছেলেপিলে আছে। আমি তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারব না। আমি জানি আমি মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু তবুও আমি পারব না। বলে কুন্তী হাঁপাতে লাগল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, সুনীলেশবাবু, আপনি চলে যান, দয়া করে এ-ঘর থেকে চলে যান, আমাকে বাঁচতে দিন।

সুনীলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যে-বাড়িতে মা অসুস্থা, বাবা কাজের জন্য বেশিক্ষণ বাইরে থাকেন, এবং অবিবাহিতা মেয়েদের ভিড় থাকে, সে-বাড়িতে বাইরের পুরুষমানুষদের আনাগোনা চলে। তার ওপর সুধেন্দুবাবু কতকগুলি ব্যাপারে চিরদিনই অত্যন্ত উদারপন্থী। বাড়িতে পাড়ার এবং বেপাড়ার দুচারজন আসা-যাওয়া করে, এ-খবর তিনি জানতেন।

ছেলেমেয়েদের তিনি কঠিন আত্মসংযম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বাইরের কোনও প্রলোভন কিংবা অশালীন প্রভাব তাঁর মেয়েদের প্রলুব্ধ করতে পারবে না।

কুন্তীর ওপর ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি আস্থা। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একদিন সে বিশ্বাসে ফাটল ধরল।

বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় খুব বড়ো জিনিস। কিন্তু এ-দুটো শব্দেরও সংজ্ঞা আছে, এবং সে সংজ্ঞাও কতকগুলি অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সেই অবস্থাগুলির পরিবর্তন হলে, সংজ্ঞাগুলিরও অর্থ বদলে যায়। কুন্তীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। একদিন কবে সমস্ত ধর্মভীরুতা এবং আত্মসংযমের বেড়া ডিঙিয়ে কে একজন ওর জীবনে প্রবেশ করে সমস্ত সংজ্ঞাগুলির অর্থ পালটে দিল।

কুন্তীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুধেন্দুবাবু সুনীলেশের হাত-দুটো জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু খবর পেলে?

কুন্তীর সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছিল, সুনীলেশ সুধেন্দুবাবুর

এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। সুধেন্দুবাবু সব শুনে একটুখানি চুপ করে থেকে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কার কথা কুন্তী বলছে, তুমি বুঝতে পেরেছ ?

কুন্তীর রুগ্না মা শয্যা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে ধপ্ করে বসে পড়লেন। তারপর বালিশের ওপর উঁচু হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সুনীলেশ বুঝতে পারল, হয়তো তিনি এই নাটকের প্রধান অভিনেতাকে চিনতে পেরেছেন। আর এ কথাও বুঝতে দেরি হল না যে সেই অভিনেতার সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

সেদিন বিদায় নেবার আগে বারবারই সুধেন্দুবাবু সুনীলেশকে শুধু কাছে টেনে নিচ্ছিলেন। আজ সুনীলেশ ওঁর পরম আত্মীয় এবং বন্ধু। বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র সুনীলেশই ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। ওর ওপরে সুধেন্দুবাবুর বিশ্বাসও অসীম। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে অপরাধীর মতো সুনীলেশের হাতটা জড়িয়ে ধরে তিনি যেন বিশ্বাসটাকে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। বিশ্বাস তো তিনি কুন্তীকেও করেছিলেন খুব !

মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধানে সমস্ত ঘটনাটা একটা সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করল। পরের দিনই বেলা আটটা নাগাদ সুধেন্দুবাবু সুনীলেশের কাছে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ দিলেন।—কুন্তী পালিয়েছে। সুধেন্দুবাবু এর আগের দিনও কেঁদেছিলেন, আজও কাঁদলেন। সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন চরম অপমানে এবং লজ্জায়। আজ কাঁদলেন শোকের উচ্ছ্বাসে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কুন্তী আর কোনও দিন ফিরবে না। তাই সুনীলেশকে উদ্দেশ করে সুধেন্দুবাবু বললেন, তুমি কি মনে কর, যে কুন্তীর এই সর্বনাশ করেছে, সে ওকে গ্রহণ করবে ? আমার কিন্তু মনে হয় না ! কিন্তু তাহলে আমার কুন্তী কোথায় যাবে ?

ততক্ষণে সুনীলেশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। ও নিজেও বেশ বুঝতে পারছিল, কুন্তী নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে।

তবুও ও সুধেন্দুবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, সুধেন্দুদা—কুন্তী আবার ফিরে আসবে।

সুধেন্দুবাবু বললেন, যাই হোক, কুন্তী বেঁচে আছে, এই খবরটা জানতে পারলে আমি আশ্বস্ত হতাম।

সেদিন সন্ধ্যায় সুশান্তর কাছে ঘটনাটা সুনীলেশ খুলে বলল। ও জানত সুশান্তর দরদী মন। সুধেন্দুদা এই বিপদে অন্তত এই একজন লোকের সহানুভূতি পাবেন।

সব কিছু শুনে সুশান্ত বললেন, কুন্তী আমাদের মতো moralist দের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়েছে। ওর পেটে যে শিশু আছে, তাকে ও বাঁচাতে চায়। আমাদের পাল্লায় পড়লে হয়তো সেই শিশুটিকে হারাতে হবে, এই ভয়ে ও পালিয়েছে। হয়তো দেখবেন, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন কিংবা কাশীর এক গলিতে একখানা নোংরা কাপড় বিছিয়ে কুন্তী ভিক্ষে চাইছে—আর মাঝে মাঝে সেই অবাঞ্ছিত শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে আদর করছে। আসল কথা কি জানেন সুনীলেশবাবু—

> "All our knowledge bring us
> nearer to ignorance
> All our ignorance bring us
> nearer to death.
> But nearness to death
> no nearer to God."

উষা বিদুষী, সুন্দরী এবং সঙ্গীতজ্ঞা। ছোটবেলা থেকেই ওর নাম এবং যশের প্রতি একটা উৎকট আগ্রহ ছিল। প্রথম জীবনে ভেবেছিল, বিদ্যা দিয়ে যশ আহরণ করবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়

খুব ভালো করে পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েই ও প্রায় স্থির করে ফেলেছিল যে বি.এ এবং এম.এ পরীক্ষায় ভালো ফল করে কলেজে অধ্যাপনা করবে। ইংরেজি অনার্স নিয়ে এলাহাবাদ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দেবার সময় সুশান্ত ওকে মাসখানেক পড়িয়েছিলেন। বি.এ তে ফল মোটামুটি ভালোই হয়েছিল, কিন্তু এম.এ.তে এসে সব গুলিয়ে গেল। অবশ্য তার কারণ ছিল।

ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেই ওর দৃষ্টি পড়ল সংগীত, নাটক এবং অভিনয়ের দিকে। ও ইউনিভার্সিটি ড্রামাটিক ক্লাব-এর একজন প্রধান পাণ্ডা হয়ে উঠল! বন্ধুবান্ধবও জুটল অনেক। এমন কি কয়েকজন অধ্যাপকও ওকে উৎসাহ দিলেন। দু-একজন বললেন, তোমার মধ্যে অভিনয় এবং সঙ্গীতের জন্মগত অধিকার রয়েছে; তুমি এগিয়ে চল।

সুশান্ত কিন্তু প্রথম থেকেই বাধা দিয়েছিলেন। অনেকদিন তিনি উষাকে বলেছেন, অভিনয় অত্যন্ত কঠিন জিনিস। সঙ্গীত ততোধিক কঠিন। ভারতীয় সঙ্গীত এবং অভিনয় বিদ্যা অর্জন করতে হলে খুব ভাল সংস্কৃতে দখল থাকা প্রয়োজন। আর তাছাড়াও সুশান্ত নিজে গভীর তত্ত্ব নিয়ে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। প্রথম অনুরাগের ছোঁয়া যখন লাগল, তখন থেকেই তিনি চেষ্টা করলেন উষাকে নিজের পথে টেনে আনতে। একদিকে সস্তা যশের মোহ, অন্যদিকে সুশান্তের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অনুশাসন, এই দুইএর মাঝখানে পড়ে উষা প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল। হয়তো সুশান্ত মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে ওর আর এম.এ পাসই করা হত না।

পিতার মৃত্যুর পর কলকাতায় বড়দার বাসায় আসা অবধি ওর সঙ্গীত এবং অভিনয়ে ভাটা পড়ল। বড়দা ওসব পছন্দ করতেন না।

বছর খানেক মনমরা হয়ে বসে থেকে, শেষপর্যন্ত উষা একটা মেয়েদের কলেজে সন্ধ্যেবেলা পড়ানোর কাজ নিল। দাদা বললেন, বসে থাকা অল্প বয়সের মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়।

বিয়ের প্রস্তাব অনেক এসেছিল। উষার মতো মেয়ের বিয়ে হতে দেরি হয় না। ওরকম গলায় মালা দেবার জন্যে কৃতি যুবকদের উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু সুশান্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর থেকে বিয়ের কথাটা কেমন করে যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

উষা স্বপ্ন দেখত ও দশজনের মধ্যে একজন হয়েছে। কাগজে ছবি বেরিয়েছে। সুন্দর বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে। আরও কত কি। সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হবার পর স্বপ্নগুলি মাঝে মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। ওঁর পাণ্ডিত্যের সান্নিধ্যে এসে উষার নাম কেনার আগ্রহটাও যেন স্তিমিত হয়ে আসত।

কিন্তু তবুও আকাঙ্ক্ষা সহজে মরতে চায় না। নারীই হোক, আর পুরুষই হোক, সচেতন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে, আকাঙ্ক্ষাগুলিকে কাজে পরিণত করবার সুযোগের অভাব হয় না।

জ্যোতিষবাবু বলে বড়দার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতার মস্ত বড় এক ফিল্ম ডিরেক্টর। প্রায়ই উষাদের বাড়িতে আসতেন। ছাত্রজীবনে দরিদ্র ছিলেন। এমনকি দশ বছর আগেও উষার বড়দার কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা ধার করে সংসার চালাতেন। এই দশ বছরের মধ্যে তিনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

রতনে রতন চেনে। উষাকে দেখেই জ্যোতিষবাবুর মনে হয়েছিল, কথাটা পাড়লে কেমন হয়। তখনো সুশান্ত কলকাতায় আসেন নি। এক ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্মদিনে বড়দার আদেশে উষা জ্যোতিষবাবুকে কয়েকখানা গান গেয়ে শুনিয়েছিল। জ্যোতিষবাবু সেদিন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বন্ধুকে সোজাসুজি মনের কথা বলে ফেললেন। ওঁর হাতে একখানা ভাল বই আছে। শিগ্‌গিরই শুটিং শুরু হবে। উষা যদি চায়, ওকে হিরোইন করে নিতে পারেন।

তিনি আরও বললেন, একেই তো বাংলা screen-এ সুন্দরীর

অভাব, তার ওপর উষা কোকিলকণ্ঠী। সোনায় সোহাগা! এক্ষুনি প্রোডিউসারকে বলে পাঁচ হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট সই করতে তিনি রাজী আছেন।

উষার দাদা জিব কেটে বারণ করলেন। তা হয় না! লোকে বলবে কি! কাকা জ্যাঠারা এখনো বেঁচে আছেন। সমাজে মুখ দেখানো যাবে না!

উষা প্রস্তাবটা বড়দার কাছ থেকে শুনেছিল। কিন্তু তখন সুশান্তর কলকাতায় আসবার সময় হয়েছে। ওঁর জন্যে বাড়ি ভাড়া করে থাকবার সব রকম ব্যবস্থা করা নিয়ে ও খুব ব্যস্ত। বড়দার বন্ধুর প্রস্তাব ভালকরে ভেবে দেখবার সুযোগ পেল না।

তারপর সুশান্ত আসবার পর বছর খানেক ধরে ওঁকে তালিম দিতে হল। একেবারেই নিঃসহায় নিঃসম্বল লোক। সুশান্ত এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসে যখন পৌছলেন, তখন ওঁর কোনও জাগতিক সম্বলই ছিল না। একটা ঝোলানো ব্যাগে মাত্র কয়েকখানা কাপড় জামা সম্বল করে সুশান্ত বসু কলকাতায় চাকরি করতে এলেন। সেই মানুষটার জন্যে সব কিছু ব্যবস্থা করে শচীন্দ্রনাথের দৈনিক কাগজে চাকরির জন্যে তৈরি করে দেওয়া বড় চারটিখানি কথা নয়।

উষা প্রথম দিকে বলত, জানো সুশান্ত, তোমার জন্যে যা পরিশ্রম করেছি, সৈন্য বিভাগে চাকরি করলে এতদিনে General হয়ে যেতাম। আর তোমার মত বিদ্যা-জগতে থাকলে নোবেল প্রাইজ পেতাম।

সুশান্ত শুধু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসত। মাঝে মাঝে বলত, আমি অনেক ভেবে দেখেছি উষা, তোমার মতো দুর্ভাগিণী মেয়ে বাংলাদেশে খুব কমই আছে।

দুজনেই হয়তো দুজনকে ভালবাসত, কিন্তু মানসিক ব্যবধান ছিল দুস্তর! একজন জাগতিক জ্ঞান বিরহিত পণ্ডিত, আর একজন আত্মসচেতন এবং দুরন্ত উচ্চাভিলাষী। দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে

লেখাপড়াও কিছু শিখেছি। আমাকে আত্মসম্মানের সংজ্ঞা না শেখালেও চলবে।

সুশান্ত হেসে হেসে বলতেন, শালীনতা আর আত্মসম্মান এক জিনিস নয়। বাইরের লোকের কাছে লম্বাহাত ব্লাউজ পরে শাড়িটাকে পায়ের নখ পর্যন্ত টেনে দিলেই আত্মসম্মান রক্ষা করা যায় না। আত্মসম্মানের সংজ্ঞা একটু অন্য রকমের।

আত্মসম্মান, চলাফেরার আদবকায়দা নিয়ে দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্কাতর্কি হত। কোনোদিন উষা ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে থাকত, কোনোদিন বা সুশান্ত গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে থাকত।

একদিন সুনীলেশের সামনেই খানিকটা তর্কাতর্কি হল। সুশান্ত জ্ঞানী লোক। উনি জানতেন, উষা অনেক ব্যাপারে না বুঝে ভুল করে। কিন্তু যে ভুল একজন না বুঝে করে, আর একজন তার সুযোগ নিতে ছাড়ে না।

সন্ধ্যেবেলা তিনজনে বসে সুশান্তর বাড়িতে চা খাচ্ছিল। এমন সময়ে উষা বলল, সুশান্ত, আমি এখন যাচ্ছি। ছ'টা বাজে, অতীনবাবু আসবেন।

সুনীলেশ বলল, অতীনবাবুকে তো চিনলাম না?

সুশান্ত বললেন, ওদের পাড়ার ড্রামাটিক ক্লাব-এর এক ভদ্রলোক— ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসেন।

উষা বলল, ভদ্রলোকের নাটক সম্বন্ধে খুব আগ্রহ আছে। কিছু পড়াশুনোও করেছেন। বিষয়টা সম্বন্ধে প্রচুর জানবার ইচ্ছে আছে।

সুশান্ত বললেন, সুনীলেশবাবু, ওকে জিজ্ঞেস করুন তো, কলকাতা শহরে এত পণ্ডিত থাকতে ভদ্রলোক উষা চৌধুরীর কাছে নাটক বুঝতে আসেন কেন?

উষা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সুশান্তর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, সুশান্ত

তোমার ইঙ্গিতগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারি। তোমার মতো পণ্ডিত না হতে পারি কিন্তু কিছুটা বুদ্ধি আমারও আছে।

সুশান্ত বললেন, আমাকে ভুল বুঝতে যেয়ো না উষা। আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করি নি। শুধু যুক্তি দিয়ে অতীনবাবুর নাটক অনুসন্ধিৎসাটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। যুক্তির ধোপে যদি তোমার বক্তব্য না টেকে, আমি কি করতে পারি বল তো?

সুনীলেশ দেখল বাদানুবাদ থেকে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। এবং তা থেকে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই পরিবেশটাকে শান্ত করবার জন্যে ও বলল, উষাদেবী, অপনি বরং এখন যান। ছ'টা বেজে গেছে। তর্ক করে লাভ নেই। সুশান্তবাবু শুধু মাত্র একটা academic discussion শুরু করেছিলেন। আলোচনাটা আরেক দিনের জন্যে তোলা রইল।

উষা বলল, না থাক, আজ আর যাব না।

সুশান্ত বলল, ধামাচাপা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। অতীনবাবু এখন এসে ফিরে গেলেও আবার রাত্রি ন'টায় আসবেন; কিংবা তুমি না ফেরা পর্যন্ত তোমার দাদার সঙ্গে বসে গল্প করবেন।

উষা কথার উত্তর দিতে পারল না। সত্যিই এরকম অনেকদিন হয়েছে। বড়দা এতে দু-একদিন অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কিছু বলবারও উপায় নেই, শত হলেও ভদ্রলোকের মুখের ওপর কিই বা বলা যায়।

সুনীলেশ বলল, তাতে আর হয়েছে কি? যদি উষাদেবী বাড়ি ফিরে দেখেন ভদ্রলোক তখনও বসে রয়েছেন, তাহলে সেরেফ বলে দেবেন— শরীর ভাল নেই, আজ আর কথা বলতে পারবেন না।

—ভদ্রলোক অত সহজে পেছু হটবার পাত্র নয়। যদি বাড়িতে এসে দেখা না হয়, তাহলে ফোন করে ব্যতিব্যস্ত করবেন। যদি তাতেও সুবিধে না হয়, সন্ধ্যেবেলা ওর কলেজের গেটের সামনে

দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভদ্রলোককে দেখেছি, বয়েস হয়েছে, কিন্তু অশেষ ধৈর্য।

আর তাছাড়া আপনি যে short cutটার কথা বললেন, উষার পক্ষে সেটা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। হঠাৎ উলটো কথা বলার অনেক অসুবিধে রয়েছে। উষা হয়তো বুঝতে পারছে না, উলটো কথা বললে যতটুকু সম্মান হানি হবে, তার চাইতে অনেক বেশি সম্মান হানি হবে যদি উলটো কথা না বলা যায়।

জানেন তো সুনীলেশবাবু, ভুল এবং অন্যায়ের একটা inertia আছে। একবার গড়িয়ে চলতে থাকলে ওগুলোকে থামানো মুশকিল।

উষা বলল, বেশ তো তুমি দেখবে, আমি অতীনবাবুকে বলতে পারি কিনা ?

—তোমার পক্ষে কোনও দিনই সম্ভব হবে না, আমি বাজি ধরতে রাজী আছি।

উষা বলল, তুমি ব্যাপারটাকে বড় করে দেখে অহেতুক ভয় পাচ্ছ।

—সিংহ শৃগালদের দেখে কখনও ভয় পায় না।

বলে সুশান্ত হাসতে লাগলেন। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, তবে শৃগালরা এসে মাঝে মাঝে হুই হল্লা করে শান্তিভঙ্গ করতে পারে বলে সিংহরা আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকে।

উষা গম্ভীর হল। ঘরের আবহাওয়াটা একটুখানি থমথমে হল।

তর্কের শেষ নেই। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাত। জীবনবোধ এবং ভাবধারার পার্থক্য। এগুলির রকম এবং প্রকার ভেদে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। উষা যাকে একটা সাধারণ জিনিস বলে মনে করে, সুশান্ত তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ নিয়ে চুলচেরা তর্কও হয়েছে অনেকদিন।

সুনীলেশ আবহাওয়াটাকে লঘু করবার জন্যে সেদিনকার মতো

বিদায় নিল। ও ভাবল, হয়তো ওর অনুপস্থিতিতে আরও লঘুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে বিষয়টার একটা স্বাভাবিক ছেদ পড়বে।

আবার ষ্টাফ রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষের নূতন scoop। হুগলী জেলার একটা গ্রাম্য ইস্কুলের হেড মাস্টার শৈলেশ সেনগুপ্তের কাহিনী।

শৈলেশবাবু সর্বজনবিদিত প্রধান শিক্ষক। পনের বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মপটুতা ছাড়াও সৎ এবং সাধু ব্যক্তি বলেও তাঁর সারা অঞ্চলে সুনামের অভাব ছিল না। কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন।

বিশ বছর আগে শৈলেশ সেনগুপ্ত বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে দেশে আসতেই হাওড়ার এক খ্যাতিসম্পন্ন উকিলের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখনকার দিনে ব্যারিস্টার ছেলের মূল্য বড় কম ছিল না। ঘটা করে বিয়ে হল। স্ত্রী ললিতা কিছুটা শিক্ষিতা ছিলেন। আর যতটা শিক্ষিতা না ছিলেন, তার চাইতেও বেশি ছিলেন নব্যভাবযুক্তা। শৈলেশকে যেন প্রথম থেকেই ওঁর গেঁয়ো মনে হয়েছিল। কিন্তু গেঁয়ো হলেও আপত্তি ছিল না, যদি ব্যারিস্টারী করে স্বামী পয়সা রোজগার করতে পারতেন।

হাইকোর্টে চার পাঁচ বছর বেরিয়েও শৈলেশের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হলেন না। ললিতার বাবা বড় উকিল ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বললেন, শৈলেশ আইন বোঝে খুব ভাল, কিন্তু হাত যশ নেই। ব্যারিস্টারী ওর পোষাবে না। অত ভাল লোকের ব্যারিস্টার হওয়া উচিত হয় নি।

শৈলেশের পিতা ছিলেন সরকারী স্কুলের হেড মাস্টার। তিনি

ছেলের হাল দেখে বললেন, বাবা, তুমি ও লাইন ছেড়ে দিয়ে B. T. পাস করে নাও। অনায়াসে হেড মাস্টার হয়ে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। নাইবা ব্যারিস্টারী করলে! তাতে হয়েছে কি?

শৈলেশ যখন B. T. পড়া স্থির করলেন, তখন ললিতার স্বপ্ন চিরদিনের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর ওপর উনি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবুও আশা ছিল যদি শেষ পর্যন্ত কিছু হয়। আর যদি কিছু নাও হয়, তবুও তো ক্লাবে পার্টিতে স্বামীকে introduce করে দেওয়া চলবে!

কিন্তু ইস্কুল মাস্টার স্বামীকে তো আর বন্ধুমহলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া চলে না!

যেদিন শৈলেশ B. T. পড়তে গেলেন, সেই দিনই ললিতা হাওড়ায় বাপের বাড়ি চলে এলেন। সংসারে শুধুমাত্র বৃদ্ধ শ্বশুর। পুত্রবধূর অভাবে তিনি কাতর হলেন। মাতৃহারা শৈলেশকে বহুকষ্টে লালন-পালন করেছিলেন। বউ ঘরে এনে ভেবেছিলেন, তাঁর দুঃখের অবসান ঘটবে। কয়েকটা বছর কেটেছিল ভালই। ললিতা যাবার আগে বৃদ্ধ শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—বউমা, শৈলেশ মাস আষ্টেক বাদে হোস্টেল থেকে ফিরবে। তুমি তার আগেই ফিরবে তো?

ললিতা উত্তর দেন নি।

শৈলেশ B. T. পাস করে নিজেই ললিতাকে আনতে গেলেন। ললিতা এলেন না। দীর্ঘ আট মাসের মধ্যে স্বামীর কাছে তিনি একখানাও চিঠি লেখেন নি। শৈলেশ বুঝতে পেরেছিলেন, ললিতা ওর জীবন থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিলেন। তবুও তিনি অনেক বোঝালেন, পীড়াপীড়ি করলেন। বৃদ্ধ পিতার অসুবিধার কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত তিন বছরের কন্যা উমার কথা বলে অনেক অনুরোধ করলেন। ললিতা বললেন, তোমার মেয়ে তুমি নিয়ে চলে যেতে পার। আমি যাব না।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত ললিতা এলেন না। শৈলেশ গ্রামের এক

ইস্কুলে হেড মাস্টারের চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। জীবনের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে ছাত্র এবং ইস্কুলগতপ্রাণ হয়ে মাস্টারী করতে লেগে গেলেন। দু-চার মাস পরপর স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন। ললিতার কাছ থেকে উত্তর কোনও দিনই আসত না। শুধু মাঝে মাঝে বৃদ্ধ শ্বশুরের কাছ থেকে দু-একখানা পোষ্টকার্ড পেতেন— ললিতা ভাল আছে, উমা প্রায়ই তোমার কথা বলে। একদিন এসে দেখে যেও। কিন্তু শৈলেশ যান কি করে? ললিতা একবারও যেতে বলেন না— ওর পক্ষে যাওয়া কি সম্ভব? উমাকে নিয়ে এসেই বা করবে কি? মানুষ করবে কি করে? তবুও তো মেয়েটা মায়ের কাছে রয়েছে!

এমনি করে বছরের পর বছর যায়। শৈলেশ কর্তব্য পালন করে চলেন। মাইনে পেয়েই বেশির ভাগ টাকা স্ত্রীর নামে মনি অর্ডার করে পাঠান। স্ত্রী চিঠি না লিখলে কি হয়, মনি অর্ডার কখনও ফেরত হয় না।

উমা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। শৈলেশ জানতেন না, মেয়ের মা মেয়ের কাছে পিতার কি ছবি এঁকেছেন। হয়তো বা বলেছেন, সেই যে কবে ওর বাবা বিদেশে গেছেন, আর ফেরেন নি। ও হারিয়ে-যাওয়া পিতার মেয়ে। আশ্চর্য কিছু নয়! ললিতার পক্ষে সবই সম্ভব!

উমার যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন ওর দাদু শৈলেশের কাছে ওর একখানা ফটো পাঠিয়েছিলেন। পিতার কাছে কন্যার সেই শেষ পরিচয়! শৈলেশও সেই পাঁচ বছরের মেয়ের স্মৃতিকে আপনার মনের মাধুরী দিয়ে সঞ্জীবিত করে রাখেন।

ইস্কুলের অন্যান্য মাস্টার মশাইরা কিংবা গ্রামের লোকরা জানতেন হেড মাস্টার বিপত্নীক। শুধু মাত্র একটি মেয়ে রেখে সতীলক্ষ্মী স্বর্গতা হয়েছেন। মেয়ে দিদিমার কাছে থেকে মানুষ হচ্ছে। উমাও মরে গেছে, এ-কথা বলতে পারলে হয়তো শৈলেশের ভাল হত, কিন্তু পিতার মন তাতে সায় দিতে পারে নি।

গ্রামের লোকরা বলতেন, মেয়েকে একবার নিয়ে আসুন। দেখি।

শৈলেশ বিপদে পড়ে বলতেন, এখানে আসতে চায় না। মেয়ে বড্ড শহুরে হয়ে গেছে।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজনের সঙ্গে শৈলেশের গোড়া থেকেই বনত না। ওরা স্কুলটাকে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করছিলেন। আজকাল তা না পারলে পয়সা রোজগার হয় না। অনেক প্যাঁচ কষে ওঁরা ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার জন্যে 'স্কুল ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড' বলে একটা ফাণ্ড তৈরি করলেন। প্রত্যেক ছাত্রকে মাইনের সঙ্গে মাসে চার আনা করে ফাণ্ড-এ দিতে হবে। প্রয়োজনীয় টাকা জমলে ইস্কুলের জন্যে দোতলা বাড়ি তৈরি করা হবে।

শৈলেশ প্রথমে কিছু বললেন না। কিন্তু যখন ম্যানেজিং কমিটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন, তখন তিনি বেঁকে বসলেন। তিনি গার্জেনদের এক সভা ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। তাঁরা বললেন, চাঁদা নেওয়া হোক, তাঁদের আপত্তি নেই— কিন্তু টাকা হেড মাস্টার মশাইর কাছে গচ্ছিত থাকবে— ম্যানেজিং কমিটির হাতে নয়। কমিটি পেছু হটল, কিন্তু প্রতিশোধের রাস্তা খুঁজতে লাগল।

বছরখানেক পরে খবর পাওয়া গেল, হেড মাস্টার মশাইর বাড়িতে এক ডাকাতি হয়েছে। ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড-এ সংগৃহীত আড়াই হাজার টাকা নিয়ে ডাকাতরা চম্পট দিয়েছে।

ম্যানেজিং কমিটি বলল, টাকা হেড মাস্টার মশাই সরিয়েছেন। চুরি যদি হয়েও থাকে তবে চোরদের সঙ্গে তাঁর সাট ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে হেড মাস্টার মশাইকে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে— নচেৎ ব্যাপারটা পুলিশের হাতে দেওয়া হবে।

শৈলেশ কথা বললেন না। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে

পেরেছিলেন। গ্রামের সাধারণ লোকদেরও ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে দেরি হল না ; কিন্তু একসঙ্গে আড়াই হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

সততার প্রতীক হেড মাস্টার মশাইর জন্যে তারা চোখের জল ফেললেন। যাঁরা টাকাটা তুলে দিতে পারতেন তাঁরাই নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শৈলেশ কিন্তু নির্বিকার। জীবনের বিচারালয়ে তিনি প্রথম থেকেই অভিযুক্ত— না হলে ললিতা বিনা কারণে ওঁকে ছেড়ে যেতেন না। একমাত্র কন্যাকে অমন করে হারাতে হত না। কাজেই কথা বলে যে লাভ হবে না, তা তিনি জানতেন। দেড়শো টাকা মাইনের গ্রাম্য স্কুলের হেড মাস্টারের পক্ষে আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করা স্বপ্নাতীত। ভবিতব্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া শৈলেশের গত্যন্তর রইল না।

ভবানীবাবু শৈলেশের বাল্যবন্ধু। তিনি ছিলেন কাছেই আর একটা স্কুলের হেড মাস্টার। শৈলেশের জীবনের সব ঘটনাই তিনি জানতেন। ললিতার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল। উনি জানতেন মাসকয়েক আগে ললিতার পিতার মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র কন্যা এখন প্রচুর অর্থের মালিক। নাইবা থাকল কোনও সম্বন্ধ স্বামীর সঙ্গে, তবুও হিন্দুর স্ত্রী তো? সবার ওপরে মানুষ তো? শৈলেশের সম্বন্ধে আর যা ধারণাই থাকুক না কেন, ওঁর সাধুতা সম্বন্ধে ললিতা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি শৈলেশকে কিছু না বলে হাওড়া চলে এসে ললিতার সঙ্গে দেখা করলেন।

সেদিন ললিতাদের বাড়িতে এক উৎসবের আয়োজন চলছে। উমার জন্মদিন। অতিথি অভ্যাগতদের ভিড়ে বাড়ি ভরে গেছে। ললিতাকে আড়ালে ডেকে এনে ভবানীবাবু সব কথা খুলে বললেন। ললিতা তো হেসেই অস্থির। ভবানীবাবু ললিতাকে বললেন, আপনার অর্থের অভাব নেই— শৈলেশ আপনার স্বামী—আপনার

কন্যার পিতা। আপনি টাকাটা দিয়ে দিন। ও মাসে মাসে কিছু কিছু করে শোধ দিয়ে দেবে।

ললিতা বললেন, যে পুরুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে পুরুষ নয়। আমার কিছু করবার নেই।

তারপর যা হবার তাই হল। শৈলেশকে বিচারের জন্যে প্রেরণ করা হল। ইন্‌ভেস্‌টিগেটিং অফিসার হেড মাস্টারের পক্ষেই রিপোর্ট দিয়েছিলেন— কিন্তু আইনে টিকল না। জোচ্চুরি এবং প্রতারণার দায়ে শৈলেশের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হল।

গ্রামের রাস্তা দিকে কোমরে দড়ি বেঁধে হেড মাস্টার মশাইকে যেদিন পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, সেদিন গ্রামের লোকরা কেঁদেছিলেন। শৈলেশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি কথাও বললেন না। ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের একবার একটা অনুরোধও জানালেন না। ওঁর কাছে প্রস্তাব এসেছিল, স্বেচ্ছায় চাকরিতে ইস্তফা দিলে ওঁকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। শৈলেশ সে-কথায়ও কর্ণপাত করলেন না। গ্রাম ছেড়ে রেল স্টেশন পর্যন্ত হেড মাস্টারের পেছন পেছন এক বিরাট মিছিল গিয়েছিল। যেন এক মৌন শোকযাত্রা। ট্রেনের লোকরা দেখে ভাবল এ আবার কেমন চোর ?

সুশান্ত আপিসে এসে খবরটা বারবার করে পড়ছিলেন। সুনীলেশ আপিসে আসতেই উনি উঠে ওর টেবিলে গেলেন। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, সুনীলেশবাবু, এও কি সম্ভব হয় ?

সুনীলেশ বলল, এর বেশী আর খবর সংগ্রহ করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল, ললিতাদেবীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করি। ওঁর ঠিকানাও যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু মন আর সায় দিল না।

সুশান্ত বললেন, ললিতাদের সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হয় না। রাত্রির অন্ধকারকে কি বারবার দেখতে হয় ? তারপর অস্থির পদচারণা করতে করতে আবার বললেন, কুন্তীও এক মেয়ে, ললিতাও এক

মেয়ে। একজন আবেগময় মুহূর্তের একটা ভুলের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নিজের জীবন দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করল, আর একজন প্রেমের স্মৃতিস্তম্ভকে চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলে চিরজীবনের সত্যের সমাধি রচনা করল। ভারি অদ্ভুত!

সুনীলেশ টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে বসে ছিল। বার বার ওর শুধু শৈলেশ সেনগুপ্তের কথাই মনে পড়ছিল।

সুশান্ত ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দূর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলে ওঠে—
তোমার ইঙ্গিতে॥"

অধ্যাপক মুরারি ঘোষদের Society for the Protection of Cultural Unity of India কলকাতার সমস্ত বুদ্ধিজীবিমহলে অনুপ্রবেশ শুরু করেছে। কঠিন সমস্যা। দেশের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যখন মতিভ্রম দেখা দেয়, তখন জাতির পক্ষে সত্যিই এক চরম সংকট উপস্থিত হয়। অনেকে আছেন, যাঁদের শিক্ষা আছে, বুদ্ধির প্রখরতা আছে, কিছুটা গভীরতাও আছে। কিন্তু ক্রমাগত অর্থাভাব, জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার অভাব তাদের মরিয়া করে তোলে।

মুরারি ঘোষ এবং ওঁর সাঙ্গপাঙ্গ এঁদের খুঁজে খুঁজে বার করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম ভাল ভাল কথা বলতে লাগলেন, এবং সামান্য কাজের বিনিময়ে আশাতীত পারিশ্রমিক দিতে লাগলেন, তারপর ওঁদের সবাইকে আস্তে আস্তে নিজেদের ভেতরকার দলে টেনে আনতে শুরু করলেন। গোড়ায় কেউ কেউ ঘোরতর আপত্তি

জানাতেন। তাঁরা বলতেন, যা ভাল বলে জানি তার বিরুদ্ধে লেখা, বক্তৃতা করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু টাকার থলের অনুরাগমিশ্রিত আহ্বান বড় নিবিড়। ক্রমে প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে এল চরম আত্মসমর্পণ। একবার আত্মসমর্পণ করলে, আর কথা নেই।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। বাবুর চেয়ে পারিষদবর্গের ঝাঁজ তীব্রতর। একদিকে যেমন ক্রীতদাসত্ব বাড়তে থাকে, অন্যদিকে টাকার অঙ্কও স্ফীত হতে থাকে। চুম্বকের মতো তারা আরও বহু জনকে টেনে নিজেদের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে একটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

বুদ্ধিজীবিদের দলে টানতে হলে বিদ্যা এবং বুদ্ধির জগতে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে হয়। তাদের তো আর সাধারণভাবে কাবু করা যায় না? তাই শিখণ্ডীর প্রয়োজন হয়! প্রয়োজন বোধে কল্পিত শত্রু দাঁড় করিয়ে, তার সঙ্গে এঁদের লড়িয়ে দিতে হয়!

অভিজিৎ মিত্র এখন মুরারি ঘোষদের দলের একজন প্রধান পাণ্ডা। ওদের সোসাইটি ওঁকে ছ'মাসের জন্যে পৃথিবী ভ্রমণে পাঠালেন। প্রতি শহরে শহরে ওঁর জন্যে ফুলের মালা আর হাততালি তৈরি হয়ে থাকল। অবশ্য দেশে যেমন হাততালি দেবার লোক ভাড়া করে আনতে হত, বিদেশেও তাই করতে হল। তবে বিদেশের কাগজগুলোর সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা হল, তিনি যা বলবেন, তা যেন ফলাও করে ছাপানো হয়।

অভিজিৎ বাবু বিদেশে গিয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু আগেই Society স্থির করে দিয়েছিলেন। প্রথম বিষয়বস্তুগুলো অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির। ভারতবর্ষের বিপদের দিনে যে সব দেশ অর্থ, উপদেশ এবং কারিগরী শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের গুণগান গাওয়া। কে কত সাহায্য

দিয়েছেন— তার কত ভাগ ফেরত দিতে হবে, আর কত ভাগ দেশের নানা কাজে লাগানো হবে, তার লম্বা ফিরিস্তি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন ভারতের প্রাইভেট সেকটর-এর শিল্পগুলির ক্রমোন্নতির ইতিহাস। দেশের কর্তৃপক্ষ-ব্যক্তিরা পাব্লিক সেক্টর-কে সমর্থন করলেও দেশের লোকদের এর পেছনে কোনও সমর্থন নেই। ভারতে টাকা লগ্নীর বিরাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে অভিজিৎবাবু শুরু করলেন দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপযশ এবং কুৎসার অভিযান। অবনত মস্তকে দেশের কোটি কোটি লোক যাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি শহরে শহরে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন, এমন কি দু-একটা বিদেশী কাগজে নিজের বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে লাগলেন। এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তিদের কেউ কেউ জীবদ্দশায় কোনও কোনও ব্যাপারে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেছিলেন। অভিজিৎবাবু সেই সব মতবাদগুলিকে খণ্ডন করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। এমন কি তিনি আরও এক ধাপ অগ্রসর হলেন। তাঁদের নামে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করতে লাগলেন।

দেশে খবর এসে পৌঁছতে লাগল। প্রথমদিকে অনেকেই বিশ্বাস করলেন না। তারপর আস্তে আস্তে সেই মৃদু গুঞ্জন কলরোলে রূপান্তরিত হতে লাগল।

ওদিকে কলকাতায় মুরারি ঘোষের কাগজ নূতন দিগন্তে সমানতালে কুৎসা প্রচার চলল। বিদেশ থেকে অভিজিৎ মিত্রের প্রচার কার্যের প্রতিক্রিয়া কিছু দিন প্রত্যক্ষ করে যখন সোসাইটি দেখল, দেশের বুদ্ধিজীবি সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন মুরারিবাবু দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। খাস কলকাতা শহরে বসে তিনি অভিজিৎ মিত্রের বক্তব্যগুলি ছাপতে লাগলেন।

কলকাতার ছাত্র এবং যুব সমাজ ঝিমিয়ে পড়েছে। সুনীলেশ

সুশান্তকে বলল, আমাদের সময় হলে এতদিনে ছাত্ররা নূতন দিগন্তের আপিস চড়াও করত, জানালার কাঁচ ভেঙে দিত, টেবিল চেয়ার দিত গুঁড়িয়ে। আর অভিজিৎ মিত্র কলকাতায় এসে পৌঁছুলে শত সহস্র কৃষ্ণ পতাকা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাত। বিদেশ গিয়ে দেশের মহান ব্যক্তিদের কুৎসা রটনার ফল হাতে হাতে পেতেন। আমরা ওরকম অনেক করেছি।

সুশান্ত বললেন, তখন দেশে এত সিনেমা ছিল না, তখন পাড়ার ছেলেরা রকে বসে সিনেমার কাগজ পড়ত না। দেশের ছেলেদের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রচুর। একটা বিদেশী জাত বুটশুদ্ধু পা ঘাড়ে তুলে দিতে চাইত বলে, সবাই ঘাড় সম্বন্ধে সজাগ ছিল। কিন্তু আজ কনষ্টিটিউসান আছে, ডেমোক্র্যাসী আছে, আরও আছে অনেক কিছু; তাই ঘোষরা মনি ব্যাগ দিয়ে আমাদের বশ করছে; অভিজিৎ মিত্রদের দল ভাষার আবরণে ভাবকে ঢেকে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন। বিদ্যা পল্লবগ্রাহী পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। না খেয়েও হয়তো মানুষ বাঁচে— অন্তত কম খেয়ে বাঁচে। কিন্তু সংস্কৃতির মৃত্যু হলে একটা জাতি চিরদিনের মত পথ হারিয়ে ফেলে। আমাদের আজ সেই অবস্থাই হয়েছে।

সুনীলেশ ছাড়াও আরও দু-চারজন সুশান্তর কথা বসে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ বিনয় সেন বললেন, ছাত্র কিংবা বুদ্ধিজীবি সমাজ প্রতিবাদ করবে কোত্থেকে? যাঁদের নামে মুরারি ঘোষদের দল কুৎসা রটনা করছেন, তাঁদের লেখা বই এরা অনেকেই পড়েন নি।

সুনীলেশ বলল, বেশ মনে আছে, সতের বছর বয়েসে যখন কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার-এ পড়ি, তখনই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ নিয়ে পুরো চর্চা চালিয়েছি। এ ছাড়াও কিছু কিছু টলস্টয়, রেঁ্যাল্যা, ডস্টোয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, মোঁপাশা এমন কি নুট হাম্‌সন নিয়েও নাড়াচাড়া করেছি। তখন ক্লাসে প্রতিযোগিতা ছিল নতুন বই পড়া নিয়ে। সপ্তাহে কে ক'খানা বই শেষ করতে পারে। হয়তো

কিছু বুঝি নি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনে জানবার এবং শেখবার জন্যে যে প্রবল আগ্রহ থাকে, তাকে বৃথা হতে দিই নি।

বিনয় সেন বললেন, এখন সতের বছরের কলেজের ছেলেরা উৎসবের দিনে 'তাসা' নৃত্য করে। যে যত অঙ্গভঙ্গি করতে পারে তার তত বাহাদুরি। পড়াশুনোর ইচ্ছে এবং জানবার আগ্রহ যে নেই, তা নয়— তবে তা বেশির ভাগই সিনেমার নটনটী এবং খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে।

সুশান্ত বললেন, অর্থাৎ জীবনবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। জাতীয় চেতনা ব্যক্তি পূজায় পর্য্যবসিত হয়েছে। যে স্রোতধারা জাতির জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতাকে ধুইয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়, সেই স্রোতধারা আজ শুকিয়ে আসছে।

আলোচনা যখন পুরোদমে চলছে তখন হঠাৎ শচীন্দ্রনাথের বেয়ারা এসে সুশান্ত এবং সুনীলেশকে জানাল, সাহেব সেলাম দিয়েছেন। বিনয় সেন বললেন, মনে হয়, শচীন্দ্রনাথ অভিজিৎ মিত্রের বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ওরা দুজন গিয়ে বসতেই শচীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, অভিজিৎ মিত্রের বক্তৃতার রিপোর্ট পড়েছেন, সুশান্তবাবু?

—পড়েছি। সুশান্ত উত্তর দিলেন।

—নূতন দিগন্তে লেখা অধ্যাপক ঘোষের লেখাগুলো সুনীলেশ নিশ্চয়ই পড়েছ?

সুনীলেশ বলল, পড়েছি স্যার।

শচীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আজ তিনি অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত।

সুনীলেশ বুঝতে পারছিল, ঘটনার পাকচক্রে Society for the Protection of Cultural Unity of Indiaর বিরুদ্ধে শচীন্দ্রনাথকে আজ প্রতিবাদ করতে হবে। অথচ ওখান থেকে তিনি

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। ওদের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বহু খবর কাগজে বিনামূল্যে ছাপছেন, বিজ্ঞাপনও এসেছে ও সূত্র থেকে অনেক। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন। অভিজিৎ মিত্র একজন বিরাট ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদেশে বসে কুৎসা রটনা করেছেন, তার সম্বন্ধে কিছু না লিখলে চলে না। সহযোগী কয়েকটি দৈনিকে ইতিমধ্যেই বহু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

সুশান্ত বললেন, আমাদের কাগজে অবিলম্বে প্রতিবাদ করা উচিত।

সুনীলেশ বলল, স্যার, We are already late.

শচীন্দ্রনাথ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে তোমরা ব্যবসা জিনিসটা বুঝতে পার না— ব্যবসায়ীকে যে কত সাবধানে চলতে হয়, সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনও ধারণাই নেই। প্রতিবাদ তো করতেই হবে, কিন্তু সে-প্রতিবাদের ধরনটা কিরকম হবে, সেইটেই তো স্থির করতে পারছি না। শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট দুজন কর্মচারী উত্তেজিত এবং অস্থির হয়ে পড়েছে। হয়তো তাঁর কাগজের অন্যান্য কর্মচারীদেরও একই অবস্থা। এ ছাড়াও বাইরে হাজার হাজার পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ড্রয়ার খুলে এক বাণ্ডিল চিঠি বের করে সুনীলেশের সামনে রেখে তিনি বললেন, তোমরা দুজন এগুলোকে পড়ে দেখ। তারপর দেখে শুনে 'Letter to the Editor'এর কলামে ছাপবার ব্যবস্থা কর। সম্পাদককে আমি জানিয়ে দিচ্ছি।

ওরা দুজন বেরিয়ে আসবে, এমন সময় সুশান্তকে উদ্দেশ্য করে শচীন্দ্রনাথ আবার বললেন, সুশান্তবাবু, অভিজিৎ মিত্রের সমর্থনেও কয়েকখানা চিঠি রয়েছে। সেগুলোও পড়ে দেখবেন।

সম্মতি জানিয়ে সুশান্ত সুনীলেশকে সঙ্গে করে শচীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুনীলেশ বলল, সুশান্তবাবু, এটা শচীন্দ্রনাথের পুরনো কায়দা।

আপিসে বসে সুনীলেশ একটা রিপোর্ট লিখছিল। হঠাৎ ওর একটা টেলিফোন এল। মাধবীর স্বামী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ফোন করেছেন। তিনি খুব দুঃখিত যে সুনীলেশ যেদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল, সেদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন বলে দেখা হয় নি। আজই সন্ধ্যার পর মাধবীকে সঙ্গে নিয়ে উনি সুনীলেশের বাড়িতে একবার আসবেন।

তাই সুনীলেশকে একটু আগেই বাড়ি ফিরতে হল। বলা যায় না, মাধবীরা কখন এসে যায়। বিশেষ করে ওর স্বামী যখন সঙ্গে থাকবেন তখন একটু আদর-আপ্যায়নের প্রয়োজনও রয়েছে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আশুতোষবাবু মাধবীকে নিয়ে এলেন। আগে মাধবী, পেছনে আশুতোষবাবু।

আজ আবার মাধবীর আর এক রূপ। এর আগে সুনীলেশ মাধবীর দুটো রূপ দেখেছে। এক দেখেছে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত, লাজুক মাধবীকে। আর এক দেখেছে গৈরিকবসনা পূজারিণী মাধবীকে।

কিন্তু আজ ওর একেবারেই অন্যরূপ। গম্ভীর, আত্মসচেতন, কিন্তু চোখেমুখে কেমন যেন একটা হতাশার ছাপ।

আশুতোষবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের পালা শেষ হতেই সুনীলেশ বলল, বসুন।

ওদিকে ততক্ষণে মাধবী রান্নাঘরে বিদ্যাধরের কাছে চলে গেছে।

সুনীলেশ আশুতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ভদ্রলোকের বয়সটা সত্যিই বেশি। পঞ্চাশের ওপর হবে। বয়স অন্তত বছর

বিশেক কম হলে মাধবীর সঙ্গে মানাত। সাধারণ মানুষ হিসেবে সত্যিই আশুতোষবাবুকে সুনীলেশের বেশ ভাল মনে হল। সাদামাঠা ধর্মভীরু ব্যবসায়ী। অর্থবান, কিন্তু বেশভূষা কিংবা চালচলনে কোনও জাঁকজমক নেই।

একথা সেকথার পর আশুতোষবাবু সুনীলেশকে বললেন, মাধবী আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি বিলাসপুর থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই তাগিদ দিচ্ছে একবার আপনার এখানে আসবার জন্যে। সময় করে উঠতে পারি না। বুঝতেই পারেন, ব্যবসায়ী মানুষ, ঝামেলার অন্ত নেই। মাঝখানে একবার দণ্ডকারণ্য যেতে হয়েছিল। নয়তো অনেক আগেই আসতাম। আপনি আমার বাড়িতে পদধূলি দিয়েছিলেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, বলতে পারি না।

সুনীলেশ তখনও আশুতোষবাবুকে লক্ষ্য করছিল। দেখলেই মনে হয় হিসেবী এবং মিতব্যয়ী ব্যবসায়ী। কিন্তু আশ্চর্য, জীবনে এত হিসেব করেও শেষকালে একটা চরম বেহিসেবীর মতো কাজ ভদ্রলোক করলেন কি করে!

সুনীলেশের সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি ভদ্রলোক কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। স্বল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ীদের সব সময় একটা inferiority complex থাকে, শিক্ষিত বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের তারা অহেতুক সমীহ করে চলে।

সুনীলেশের কিন্তু ভাল লাগছিল না। মাধবীর স্বামীর সঙ্গে ওরকম একটা কৃত্রিম ব্যবহার করতে নিজের যেন কেমন বাধবাধ ঠেকছিল। কিন্তু উপায়ও কিছু নেই। আশুতোষবাবুর জীবনে বিলাসপুরের বন, কাঠ আর গদির কর্মচারীরা ছাড়া আর কিছুরই কোন মূল্য নেই। বার বার কথা বলতে গিয়ে একই প্রসঙ্গে তিনি ফিরে আসছিলেন।

সুনীলেশ কিন্তু সর্বক্ষণ আশা করছিল মাধবীর প্রসঙ্গ উঠবে। উঠলে ভাল হত। কাঠের ব্যবসায়ীর জীবনে মাধবীর আগমন কোনও

আলোড়ন এনেছে কি না জানবার জন্যে ওর মনে আগ্রহের সীমা ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আলাপ-আলোচনার মধ্যেও সে-প্রসঙ্গ উঠল না দেখে ও রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু বলবারই বা আছে কি?

এর মধ্যে বিদ্যাধর এবং মাধবী দুজনে মিলে খাবারের প্লেট ও চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে এসে উপস্থিত হল। সুনীলেশের প্লেটটা নিয়ে এল মাধবী, আর আশুতোষবাবুর প্লেটটা নিয়ে এল বিদ্যাধর। সুনীলেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল মাধবীর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রায় মাস তিনেক আগে মাধবীর সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয়েছিল। তখনও মাধবীকে সুনীলেশের এমন বেসুরো মনে হয় নি। আজ যেন মাধবী সত্যিই কেমন আনমনা এবং উদাসীন। পরনে মূল্যবান শাড়ি, গায়ে জমকালো গয়না। কবরী সুবিন্যস্ত— কিন্তু তবুও কোথায় যেন জীবনের তাল কেটেছে।

একটুখানি চুপ করে থেকে সুনীলেশ মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, রক্ষা তুমি আশুতোষবাবুর সঙ্গে এসেছিলে, নইলে ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রতা রক্ষা করাই দায় হত।

আশুতোষবাবু বললেন, ছি! ছি! কি যে বলেন সুনীলেশ-বাবু! আমার সঙ্গে আবার ভদ্রতা রক্ষা করবার কি আছে? কি বল মাধবী?

মাধবী একটুখানি হাসল। সুনীলেশ বেশ বুঝতে পারল, এ হাসি মাধবীর হাসি নয়।

আশুতোষবাবু চা খাবার পর সুনীলেশের বিছানায় একটা বালিশের ওপর হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর হয়তো ভদ্রলোকের একটু বিশ্রাম নেবার দরকার হয়ে পড়েছিল। সুনীলেশ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেদিন ছিল একটা বসন্তের সন্ধ্যা। হয়তো আরও বহু বসন্তের যে কোনও একটা সন্ধ্যার মতোই। কিন্তু তবুও সুনীলেশের মনটা কেমন

যেন উদাস হয়ে পড়ল। বিয়ের আগে ছাদের থামটা ধরে দাঁড়িয়ে মাধবী ওর কাছ থেকে দূরত্ব রক্ষা করত। আজও সেই থামটা ধরে ও দাঁড়িয়ে ছিল। ঝোড়ো হাওয়া ছাদের বারান্দার সেই ঝুলন্ত আলোটাকে এদিক-ওদিক আন্দোলিত করছিল। মাধবীর মুখটাকে একবার স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল ; আর একবার ক্ষণিক আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছিল। আলো আঁধারের খেলা।

নির্বিকার স্থানুর মতো মাধবী চোখ বুঁজে সেই থামটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক স্বপ্নের ছায়ামূর্তি।

সুনীলেশ আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে ডাকল, মাধবী ?

উত্তর নেই। একবার, দুবার, তিনবার ডেকেও সুনীলেশ মাধবীর কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না।

এর মধ্যে হঠাৎ আশুতোষবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সুনীলেশবাবু, ওকে ধরুন। ও পড়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে সুনীলেশ মাধবীকে দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরল। ততক্ষণে মাধবী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। দুজনে মিলে মাধবীর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে ধরে এনে সুনীলেশের বিছানার ওপর শুইয়ে দিল।

আশুতোষবাবু অপরাধীর মতো বললেন, আজ মাস দুই হয় মাধবীর হিষ্টিরিয়ার মতো হয়েছে। বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না।

সুনীলেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তাররা কি বলেছেন ?

আশুতোষবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, ডাঃ সেন বলেছেন, ছেলেপিলে না হলে এ রোগ সারা মুশকিল।

একটু পরেই মাধবী চোখ মেলে তাকাল। জ্ঞান হতেই দেখে ওর একটা হাত সুনীলেশের হাতের মধ্যে। চোখ বুজে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ ও উঠে পড়ল। আশুতোষবাবু বললেন, আরও একটু বিশ্রাম কর— তোমার শরীর ভাল নেই।

মাধবী শুনল না। অসংবৃত শাড়িটাকে একটুখানি ঠিক করে নিয়ে সুনীলেশের বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েই বলল, বিদ্যাধরদা আমাকে একটুখানি গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো তো?

বিদ্যাধর মাধবীর ডান হাতটা ধরে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আশুতোষবাবু উঠে মাধবীর পেছনে পেছনে চললেন। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সুনীলেশকে দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আজ তাহলে আসি, একদিন আমাদের ওখানে আসবেন।

মাধবী কিন্তু আর ফিরেও তাকাল না।

উষা মনস্থির করে ফেলেছে। ও সিনেমায় নামবে। ওর বড়দা ভয়ানক আপত্তি করলেন। কিন্তু বউদি ওর পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আজকাল বহু ভদ্রলোকের মেয়েরা অভিনয় করছে। সে পুরনো দিন আর নেই। উষার যখন প্রতিভা রয়েছে, তখন তাকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

জ্যোতিষবাবুই বউদিকে দলে টেনেছিলেন। তিনি শিক্ষিত লোক; কথা বলবার কায়দা জানেন। যুক্তিতর্কের অবতারণা করে উষার বড়দাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধাও দিলেন না, সম্মতিও দিলেন না। বউদির সমর্থনপুষ্ট হয়ে উষা মত দিল জ্যোতিষবাবু আনন্দিত হলেন। উষা যদি প্রথম বইতে কৃতকার্য হয় তো তাঁরও কপাল ফিরবে। নূতন হিরোইন আবিষ্কারের মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সবাই বলবে উষা চৌধুরীকে জ্যোতিষবাবু খুঁজে বের করেছিলেন। তাতে ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর মূল্যও অনেক বেড়ে যাবে। এক আনন্দমুখর সন্ধ্যায় হৃষ্ট চিত্তে তিনি উষাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু উষার সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল সুশান্ত। ও

জানত কিছুতেই ওঁর সমর্থন পাওয়া যাবে না। জ্যোতিষবাবুকে মত দিয়েও উষার অশান্তির সীমা ছিল না। ও ভাল করেই জানত, বড়দাকে কাত করা গেছে, কিন্তু সুশান্তকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে।

সেদিন সুনীলেশকে সঙ্গে করে আপিস থেকে বাড়ি ফিরেই সুশান্ত দেখেন, উষা বসে আছে। সাধারণতঃ এ সময়ে ও কখনও আসে না। সুশান্ত বুঝতে পারলেন, কোনও বিশেষ ব্যাপার ঘটেছে, নইলে এ সময়ে ওর আসবার কথা নয়।

উনি প্রথমে কথা বললেন না। জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে টেবিলের সামনে বসলেন। সুনীলেশ ততক্ষণে একটা বিলিতি কাগজের মধ্যে মনোনিবেশ করেছে।

উষা উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে খাবার এবং চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে গম্ভীর হয়ে জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

সুশান্ত বললেন, ব্যাপার কি উষা? এ সময় তো তুমি কখনও আস না।

উষা চুপ করে বসে রইল। উত্তর না পেয়ে সুশান্ত ওর কাছে উঠে গিয়ে আরও আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, লক্ষ্মীটি কি হয়েছে বল না? দোহাই তোমার অমন চুপটি করে থেকো না।

উষা তখনও নির্বাক।

উত্তর না পেয়ে সুশান্ত সুনীলেশের সামনে গিয়ে বসলেন। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, সুনীলেশবাবু, উষা কেন এসেছে জানেন? ও এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছে, যাতে আমার সমর্থন নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।

সুনীলেশ বলল, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

সুশান্ত বললেন, ও সিনেমায় নামা স্থির করে ফেলেছে। জ্যোতিষ-বাবুর ফাঁদে পা দিয়েছে।

সুনীলেশ চুপ করে রইল।

চা খাওয়া শেষ করে সুশান্ত উষাকে ডেকে বললেন, কাছে এসে বসো। তোমার বয়েস হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছ। যা করা স্থির করেছ, তা করবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার রয়েছে। কথা বলছ না কেন?

উষা তখনও চুপ করে বসে। ও যেন কিছুতেই সুশান্তর মুখোমুখী হতে পারছিল না। এইবার সুনীলেশ উষাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি অভিনয় ভালবাসেন?

উষা এইবার একটু কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আস্তে আস্তে বলল, ওটা আমার নেশা। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় আমার ভাল লাগে।

হঠাৎ সুশান্ত মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, তোমার কথাটা কিছুটা সত্য হলেও পুরো সত্য নয়। কৈশোরে এবং যৌবনে হয়তো সত্যিই তুমি অভিনয় ভালবাসতে। কিন্তু আজ তোমার নেশা অর্থের এবং যশের, অভিনয়ের নয়।

উষা বলল, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না সুশান্ত। তুমি তো নিজেকে শিল্পী বলে জাহির কর। কলেজে অধ্যাপনার সময়ে ছেলেদের সঙ্গে কত আবৃত্তি করেছ, ক্লাসে অভিনয়ের ওপর বক্তৃতা করেছ।

সুশান্ত বললেন, নিশ্চয়ই, আমি সঙ্গীত এবং অভিনয়কে ভালবাসি। ওগুলো মানুষের জীবনের মহামূল্যবান জিনিস। তুমি অভিনয় কর, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে সিনেমার কণ্ট্রাক্টে সই করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন দেখি নে। অভিনয় যদি তোমার নেশা হত, তাহলে তুমি অর্থ রোজগারের সঙ্গে ওটাকে যুক্ত করতে না।

উষার চোখেমুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। ওর কেবলি মনে হতে লাগল, সুশান্ত যেন বড্ড অবাস্তব কথাবার্তা বলে।

সুনীলেশের অবস্থাটাও একটু অসুবিধেজনক হয়ে পড়ল। ও বুঝতে পারছিল, সুশান্ত আর উষার মধ্যে একটা গুরুতর মতভেদ আসন্ন। সেটা কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল।

ও বলল, উষাদেবী, আপনি কি সিনেমায় নামা স্থির করে ফেলেছেন?

উষা বলল, বলতে পারি নে; হয়তো একটা সিদ্ধান্ত শিগগিরই নিতে হবে।

সুশান্ত চুপ করে বসে ছিলেন। ওঁর জীবনে এ একরকম চরম পরাজয়। আজ আট বছর হল উষার সঙ্গে ওঁর পরিচয়। আজকে এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন, দুজনের মধ্যে মানসিক ব্যবধান কত গভীর।

গত কয়েক বছরের ঘটনাগুলি সুশান্তর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। বি. এ. পড়বার সময় উষা এতটা ambitious হয়ে ওঠে নি। তখন ও বলত এম. এ. পাস করবার পরই ডি-ফিল নেবার চেষ্টা করবে।

সুশান্ত ওর বিষয় পর্যন্ত স্থির করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন "English Literature in the British Colonies"-এর ওপর ও কাজ করবে।

উষা প্রথম প্রথম সাহস পেত না। বলত, আমার ভয় করে, কি লিখতে কি লিখে ফেলব! কিন্তু আবার সুশান্তর দিকে তাকিয়ে সাহস পেত। ও জানত, এমন এক ব্যক্তি ওর পেছনে রয়েছেন যাঁর সাহায্য পেলে ও বিদ্যাজগতের যে কোনও বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবে। মাঝে মাঝে বলত, সুশান্ত, তোমার কথা যতই ভাবি ততই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। অনেক সময়ে মনের গোপন কোণে হয়তো তোমাকে খানিকটা ঈর্ষ্যাও করি।

তারপর সুশান্তর হাতটা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলত, কোথা দিয়ে কখন এসে আমার জীবনটাকে

তুমি এমন তছনছ করে দিলে। শত চেষ্টা করেও তোমাকে বাধা দিতে পারলাম না।

সুশান্তর চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল উষার আহ্বানে। উষা বলল, সুশান্ত আমি যাচ্ছি। সুশান্ত বুঝতে পারলেন, ও যা বলতে এসেছিল, তা বলতে পারে নি। অন্যদিন হলে উষাকে চেপে ধরতেন। কিন্তু আজ পরাজয়ের গ্লানি ওঁকে হতাশ করে দিয়েছিল। উষা ওঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তার জন্যে দুঃখ যতটা না হল, তার চেয়েও বেশি দুঃখ হল, ওর অনাগত সঙ্কটের কথা চিন্তা করে। তাই উষার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, আপনারও তো যাবার সময় হল, একবার যদি উষাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান, তো বড় ভাল হয়।

উষার সামনে সত্যিই এক নিদারুণ সমস্যার উদ্ভব হল। যখন ও মনস্থির করে ফেলল, সিনেমায় নামবেই, তখন ওর আরও একটা জিনিস সম্বন্ধে মনস্থির করতে হল— যা করেই হক্ সুশান্তকে এড়িয়ে চলতে হবে। ব্যাপারটা বড় সোজা নয়! একদিন না গেলেই সুশান্ত বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন, আজ আস নি কেন? শরীর ভাল তো? তখন উত্তর দেওয়া বড় মুশকিল হয়ে পড়বে! হয়তো তখনকার মত যা হক্ করে একটা উত্তর দিয়ে দিলেও, পরে সামনে এসে পড়লে এড়িয়ে চলা মুশকিল হবে!

তবে সুশান্তর দুর্বলতম স্থান উষার জানা ছিল। ও জানত ওঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল গগনচুম্বী। একবার আত্মসম্মানে আঘাত করতে পারলে উনি আর কখনও উষার পথরোধ করে দাঁড়াবেন না।

কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটা অসহায় মানুষকে অমন করে এড়িয়ে চলা বড় সহজ কথা নয়।

সেদিন সারা রাত্রি ধরে উষার মনে সুশান্তকে নিয়ে এক নিদারুণ

দ্বন্দ্ব চলল। বারবার একখানা অসহায় মুখ ওর সামনে ভেসে উঠছিল। শুধুই কেবল মনে হচ্ছিল, অন্যায় করা হচ্ছে না তো!

উষা কথা গোপন করলেও সুশান্ত বুঝতে পেরেছিলেন, ও Contract সই করেছে।

রোজ আপিস যাবার আগে উষা আসত। প্রথম যেদিন এর ব্যতিক্রম ঘটল সেইদিনই সুশান্ত ব্যাপারটার সত্যতা আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারলেন। কোনও বিশেষ কারণ না ঘটলে উষা অনুপস্থিত হত না। আর যদিও বা শারীরিক অসুস্থতার জন্যে অনুপস্থিত থাকত, তাহলেও হয় লোক মারফত চিঠি লিখে পাঠাত, নয় আপিসে টেলিফোন করত। যেদিন প্রথম এ দুটোর মধ্যে কোনটাই হল না, সেইদিন থেকেই সুশান্তর মনে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। সুশান্ত বুঝতে পারলেন, উষা জীবনের ধারা বদলে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

পরের দিন সুশান্ত আপিসে যেতেই সুনীলেশ আঁচ করতে পারলে, ব্যাপারটা জটিলতর হয়েছে। সুশান্তর জামাকাপড়ের হাল খারাপ, মুখে গোছা গোছা দাড়ি। এ যেন অন্য এক সুশান্ত।

সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল, আজকে বুঝি উষাদেবী আসেন নি?

সুশান্ত বললেন, না! শুধু আজকে নয়। কোনও দিনই আর আসবে বলে মনে হয় না!

সুনীলেশ চুপ করে রইল। সত্যিই উষা ওঁর মতো লোককে এমন করে উপেক্ষা করতে পারে, তা ওর কল্পনারও অতীত। চিন্তায় এবং আদর্শে সংঘাত হলেই নিষ্ঠুর হতে হবে, এমন কথা তো কোথাও লেখা নেই!

দিন কয়েক পরে একদিন আপিস থেকে সুনীলেশ সুশান্তর সঙ্গে

ওঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। সারা সন্ধ্যা সুশান্ত একটা কথাও বললেন না। তারপর খাবার সময় হতেই শুধু এঘর-ওঘর করতে লাগলেন। অনেকটা condition reflex এর মতো। ঠিক রাত্রি নটার সময়ে উষা চাকরকে দিয়ে চিঠি পাঠাত। আজ কয়েকদিন হল সে আসছে না। এ-ব্যতিক্রম সুশান্তর পক্ষে নিদারুণ বেদনা-দায়ক হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু দুঃখ যখন মনের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করে, তখন তার প্রথম প্রকাশ হয় বাক্যহীনতায়। অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে আঘাত এলে, তার জন্যে মানুষের মন তৈরি হবার সময় পায় না। মনকে তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। অনেক বেদনা নীরবে চোখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। তারপর অবশ্য হয়তো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়, তবুও ভেতরে ক্ষত থাকে অনেকদিন। সুশান্তর পক্ষে উষার কাছ থেকে এ-আঘাত ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে এ যেন এক নূতন অধ্যায়।

সুশান্ত চিরকাল বই পড়ে কাটিয়েছেন। কোনও দিন মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন নি। মন-দেওয়া-নেওয়ার পর্ব জীবনে কখনও ঘটে নি। উষাই প্রথম নারী, যার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আস্তে আস্তে উষা সুশান্তর মনোরাজ্যে নিজের আসন পেতে নিয়েছিল। উনি কখনও ভাবতেও পারেন নি যে সে-আসন শূন্য করে উষা কোনওদিন চলে যাবে।

সুশান্তকে নীরব দেখে সুনীলেশ বলল, সুশান্তবাবু, আমার একটা অনুরোধ আছে।

সুশান্ত বললেন, বলুন।

—এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনি আমার ওখানে চলুন। একা এ-বাড়িতে আপনার আর থাকা উচিত নয়।

সুনীলেশ ভাবছিল, হয়তো পরিবর্তিত আবহাওয়ায় গেলে সুশান্তর মনটা একটু হালকা হবে।

সুশান্ত একটুখানি ভেবে বললেন, আমাকে কয়েকটা দিন ভাববার সুযোগ দিন সুনীলেশবাবু।

সুনীলেশ চুপ করে রইল।

হয়তো সুশান্ত তখনও মনে মনে উষার প্রত্যাগনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন।

প্রায় মাসখানেক পরে সুশান্ত আপিসে বসে সুনীলেশকে একদিন বললেন, বহুদিন উষার সঙ্গে দেখা হয় না, চলুন, একদিন ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। সুনীলেশ প্রথমে যেতে রাজী হল না। সত্যিই উষার সম্বন্ধে ওর ধারণা একবারে বদলে গিয়েছিল। কিন্তু সুশান্ত নাছোড়বান্দা। ওকে যেতেই হবে।

সুনীলেশ বলল, যাবার আগে উষাদেবীকে বরং একটা টেলিফোন করে নেওয়া উচিত। তিনি হয়তো আজকাল রোজই স্টুডিওতে যাচ্ছেন।

কম্পিত বক্ষে সুশান্ত উষার দাদার বাড়ির নম্বরটা ডায়েল করলেন। মনে কেবল এক চিন্তা, উষা টেলিফোন ধরবে তো? ফোন ধরলেন উষার বউদি। তারপর মিনিট কয়েক পরে উষা এসে টেলিফোনে কথা বলল।

বেদনায়, অপমানে এবং লজ্জায় সুশান্তর সমস্ত শরীরটা তখন কাঁপছিল। কিন্তু তবুও ভালবাসা অন্ধ— তবু ইচ্ছে করে উষার সঙ্গে কথা বলতে, উষা কেমন আছে জানতে।

সুশান্তর গলা শুনেই ফোনে ওদিককার শব্দ নিস্তেজ হয়ে এল।

সুশান্ত এদিক থেকে বললেন, উষা, তোমার সাথে বহুদিন দেখা হয় না। আজ একবার দেখা করতে পারি?

ওদিক থেকে উত্তর এল, আজ সময় হবে না।

তখন সুশান্ত একটু চড়া গলায় বললেন, বেশ তো, কাল, পরশু, যেদিন তুমি সময় করতে পারবে বল।

সুনীলেশ বুঝতে পারছিল, প্রত্যেকটা কথার উত্তর দিতে উষাদেবী

বেশ সময় নিচ্ছিলেন। কে জানে, হয়তো, সরমে কুণ্ঠায় এবং লজ্জায় ওদিককার কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসছিল।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত বললেন, পরশু সন্ধ্যায় গেলে দেখা হতে পারে।

মাঝের একটা দিন সুশান্ত অস্থির ভাবে কাটালেন। উষার সঙ্গে কোনও দিন টেলিফোন করে এন্‌গেজমেন্ট করতে হবে, এ কথা উনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

যাবার দিনও সেই এক অবস্থা। আপিসে এসে অবধি সুশান্ত শুধু ঘড়ি দেখছিলেন। আপিসের ঘড়িতে যখন চারটা বাজল, তখন সুশান্ত সুনীলেশকে ডেকে বললেন, আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

সুনীলেশ আবার ঘোরতর আপত্তি জানাল। প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গোপনে আলাপ হবে। অনেক মান-অভিমানের পালা চলবে। তার সঙ্গে হয়তো বা থাকবে অনেক আকুতি এবং অশ্রুজল। এর মধ্যে বাইরের লোকের উপস্থিতি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

কিন্তু সুশান্তর মনের অবস্থাটা তখন একটু অন্য ধরনের। উষার ওপর উনি একেবারেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেবলি ভাবছিলেন, হয়তো একা পেয়ে উষা ওঁকে অপমানও করতে পারে। সুনীলেশ সঙ্গে থাকলে অপমানের মাত্রাটা একটু কম হতে পারে।

সুশান্তর মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে সুনীলেশ বলল, আমার যাওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি নে। তবুও আপনি যখন বলছেন, তখন যেতেই হবে।

উষাদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সুশান্ত বললেন, সুনীলেশবাবু, উষা মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল। ওর মনটা খুব নরম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ওর সীমাহীন ambition নিয়ে। বড়দার বন্ধু জ্যোতিষবাবু ওর মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছেন। দেখবেন, এ লাইনে ও বেশিদিন থাকবে না। আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারি নে যে উষা এমন করে আমাকে এড়িয়ে চলতে পারে।

সুনীলেশ এ কথার জবাব দিল না। এ কথাগুলো সবই সুশান্তর স্বগতোক্তি। ওঁর মনের মধ্যে তখন দুটো সংগ্রামের ধারা চলছে। একটা হচ্ছে, উষা ওকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছে, আর একটা হচ্ছে, উষা ভুল করে এ পথে গেছে, আবার ফিরে আসবে।

সুশান্ত উষাকে ভালবাসেন। আজই, এই মুহূর্তে কোনও চরম উপসংহারে এলে নিজের ভালবাসাকে আঘাত করতে হয়। কোন মানুষই তা চায় না।

উষাদের বাড়িতে ঢুকেই সুনীলেশ দেখল বাইরের ঘরে চার পাঁচজন জাঁদরেল লোক বসে রয়েছেন। সবাই বড় বড় গাড়িতে করে এসেছেন। এঁদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই প্রায় অবাঙ্গালী। উষাদেবীর এরই মধ্যে নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজগুলোতে উষাদেবীর জয়গান গাওয়া হয়েছে। নতুন বইয়ে অভিনয়রতা উষাদেবীর ছবিও ছাপা হয়েছে। নতুন হিরোইন জ্যোতিষবাবুর আবিষ্কার। বহুদিন বাংলার ছায়ামঞ্চে এমন হিরোইন আসেন নি। বাইরের ঘরের ভিড় এই প্রশংসার পরিচায়ক। স্টুডিও রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রোডিউসাররা উষার সঙ্গে কনট্রাকট সই করতে চাইছেন।

ওঁরা দুজন বাইরের ঘরে চুপটি করে এক কোণে বসে রইলেন। সুশান্ত বহুবার এ-বাড়িতে এসেছেন। এই ঘরেই বসেছেন। কিন্তু আজ যেন নতুন করে এ-বাড়ির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। তখন উষা দোতালার বারান্দায় ওঁর জন্যে অপেক্ষা করত। নিজে দৌড়ে এসে দরজা খুলে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরের ঘরে নিয়ে বসাত।

আজও উষা এ-বাড়িতে রয়েছে। ঘরের চেয়ার, টেবিল, গদি, দেওয়ালে-টাঙানো ছবি, সব যেমন ছিল, তেমনি আছে। যার জন্য এ-বাড়িতে আসা শুধু তারই মধ্যে এসেছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন।

একে একে সবার ডাক পড়তে লাগল। এর মধ্যে এক ভদ্রলোক

এসে সুশান্তর কাছ থেকে একটা শ্লিপ নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রোডিউসারদের ভিড় কমতে কমতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। বাড়ির ভৃত্য ঘরের লাইটটা জ্বেলে দিয়ে গেল। সুশান্ত ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। সুনীলেশেরও ভাল লাগছিল না। টেলিফোনে এনগেজমেণ্ট করেছেন সুশান্ত, তবুও এত দেরি ওর অসহ্য লাগছিল। উষাদেবী বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন বই কি ?

সন্ধ্যা উতরে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে উষা ঘরে ঢুকল। পরনে একখানা সাধারণ আটপৌরে শাড়ি। সুশান্ত চেয়ে দেখলেন ঠিক সেই উষাই। তবে রুজ লিপস্টিকের দাগ মুখ থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

আজও ঠিক আগেকার মত উষা তরঙ্গায়িত দেহের নূপুর শিঞ্জনে ঢুকল। সুনীলেশ বসেই ছিল। ওকে দু-হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বলল, বস।

সুশান্ত বসলেন। তখন ওঁর চোখে মুখে উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট। সুনীলেশ উঠে গিয়ে একটা জানালার ধারে দাঁড়াল। উষা এবং সুশান্তর মাঝখানে বসে থাকা ওর পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। সুশান্ত কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, উষা, তোমার শরীর ভাল আছে তো ? আজকাল gastritis-এর ব্যথাটা কেমন আছে ?

উষা মাথা নিচু করে জবাব দিল, ভালই আছি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ।

সুশান্ত আবার বললেন, এ তুমি কি আরম্ভ করেছ উষা ?

রাজনীতির একটা পুরনো খেলা খেলবার জন্যে উষা তৈরি হয়েই ছিল। শত্রুকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিতে নেই। সুশান্ত ওঁর যুক্তিজাল ছড়াবার আগেই উষা ওকে আক্রমণ করে বসল। অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনি কি বলতে চান বলুন, সুশান্তবাবু। আমার ন্যাকামী ভাল লাগে না। আপনার জন্যে আমার জীবনে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

সুশান্ত এইবার মাথা নিচু করলেন। এ কথার আর কোনও উত্তর দেওয়া চলে না। জানালার ওধার থেকে সুনীলেশ প্রমাদ গুনল। কিন্তু ও জানত সুশান্ত এখন আর কথা বলবেন না।

প্রায় পাঁচ মিনিট উষা চোখ বন্ধ করে বসে রইল। অমিতবিক্রমে একজন অসহায় এবং নির্দোষ লোককে আক্রমণ করবার পরিশ্রম এবং ক্লান্তি বড় কম নয়। ওদিকে সুশান্তও হতবাক হয়ে বসে ছিলেন। জীবনে যাকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবেসেছেন, তার কাছ থেকে পাওয়া আঘাতটাকে সহ্য করবার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

বর্ষার এক রিমিঝিমি সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসের সেই সুসজ্জিত বাড়ির বাইরের ঘরে এক বলিষ্ঠ প্রেমের অপমৃত্যু ঘটল। আর তার সাক্ষী রইল দৈনিক কাগজের ষ্টাফ রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষ।

উষাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে পথ চলতে শুরু করেছে। সুশান্ত মাথা নিচু করে আগে আগে হাঁটছিলেন। সুনীলেশ পেছন থেকে দেখছিল, একটা ঋজু পত্রশোভিত দেবদারু বৃক্ষের ডালপালা-গুলিকে কে যেন কেটে ফেলেছে। হঠাৎ সুশান্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন বুঝলেন সুনীলেশবাবু ?

—যা বুঝলাম তা না বলাই ভাল। আপনার জন্যে মনে বড়ই দুঃখ পাচ্ছি।

সুশান্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই তো আপনাদের দোষ। যার জন্যে দুঃখ পাওয়া উচিত তাকে ছেড়ে আর একজনের জন্য দুঃখ পেয়ে লাভ কি ?

তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, উষার জন্যে ভাবুন সুনীলেশবাবু, ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। আমি কিন্তু ওর জন্যে বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আজ আমাকে ও যতখানি আঘাত করেছে, তার চাইতেও হয়তো অনেক বেশি আঘাত ওর জন্যে জমা হয়ে রইল। জীবনের কোথাও কোন ছন্দপতন না ঘটলে উষা

আমার সঙ্গে এ-ব্যবহার করতে পারত না। ও যাকে নতুন জীবনের জয়যাত্রা বলে মনে করেছে, আসলে তা হয়তো ওর জীবনের শোকযাত্রা। চলবার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ও যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই।

সুনীলেশ আর একটি কথাও বলল না। ওর বলবার সত্যিই কিছু ছিল না।

আপিসে যেতেই শচীন্দ্রনাথের ঘরে সুনীলেশের তলব পড়ল। শচীন্দ্রনাথ একখানা কার্ড হাতে দিয়ে বললেন, জান তো, বদ্রীদাস আগরওয়ালা আমার বিশেষ বন্ধু। ওদের চেম্বারে আজই একটা প্রেস কন্‌ফারেন্স আছে। আর কেউ গেলে চলবে না। তোমাকেই যেতে হবে।

শচীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, এমন সময়ে তিনি আবার সুনীলেশকে ডেকে বললেন, বিকেল তিনটেয় প্রেস কনফারেন্স। যদি পার তো দু'টো নাগাদ চেম্বার-এর আপিসে গিয়ে বদ্রীদাসের সঙ্গে একবার দেখা করো। উনি বিশেষ করে অনুরোধ করে গেছেন।

সুনীলেশের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বদ্রীদাস আগরওয়ালা এক বিশিষ্ট চেম্বার অফ্ কমার্স-এর সভাপতি। অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ঘোরেল লোক! সারা দেশে হেন লোক নেই যার সঙ্গে ওঁর চেনা জানা নেই। ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত ওঁর পরামর্শ নেন। বদ্রীদাস হঠাৎ প্রেস কন্‌ফারেন্সের আগে ওকে যখন দেখা করতে বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে।

সম্প্রতি বদ্রীদাসবাবু একটা নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন। দেশের লোকদের মধ্যে আত্মসম্প্রীতি বাড়ানোর আন্দোলন। কয়েকদিন আগে শচীন্দ্রনাথের কাগজে কয়েকখানা কার্টুনের মতো ছবি

ছাপা হয়েছিল। তলায় ছিল ছোট্ট একটা লেখা। কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি বদ্রীদাস আগরওয়ালা দেশের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্যে একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে সম্প্রীতি আন্দোলন। এটা নাকি সর্বোদয় আন্দোলনের সমপর্যায়ে পড়ে!

বদ্রীদাস জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, জাতি ধর্ম উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সবাই সবাইকে সম্মান করে চললেই জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি পাবে। এতে শহরের গুণ্ডাবাজী কমে যাবে অনেক। ঝগড়াঝাঁটি থেমে যাবে, কোর্ট কাছারিতে গিয়ে মানুষের অহেতুক সময় এবং পয়সা নষ্ট হবে না।

এক সহযোগী পত্রিকায় এরই মধ্যে বদ্রীদাসের আন্দোলন সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক লেখা বেরিয়েছে। তারা লিখেছেন, বদ্রীদাস আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে নাম কিনতে চাইছেন। অন্য এক দৈনিকে খবর বেরিয়েছে, বদ্রীদাস সতেরোটা মিলের মালিক, তার মধ্যে তেরোটাতে তিনমাস হল লক্‌-আউট চলেছে। যে মালিক নিজের শ্রমিকদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে একটা জাতীয় আত্মসম্প্রীতির আন্দোলন চালানো মূঢ়তা।

কিন্তু শচীন্দ্রনাথ বদ্রীবাবুকে সমর্থন করে এসেছেন। এমন কি এডিটোরিয়াল কলামের দ্বিতীয় লীডার লিখিয়েছেন ওর আন্দোলনকে সমর্থন করে। কিন্তু একা শচীন্দ্রনাথ করবেন কি?

বেলা আড়াইটে নাগাদ সুনীলেশ বদ্রীদাস আগরওয়ালার চেম্বার অফ্ কমার্সে গিয়ে উপস্থিত হল। বদ্রীদাসবাবু সুনীলেশকে দেখে ভারী আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, বড় খুশী হলুম। জানেন তো শচীন্দ্রনাথ আমার বন্ধু। আমার দু-একটা কোম্পানিতে ওঁকে ডিরেক্টর করে নিয়েছি। বুঝতে পারেন তো, দৈনিক কাগজের মালিক সঙ্গে না থাকলে আজকাল ব্যবসা চালানো মুশকিল। যতদূর সম্ভব আমি ওঁকে সাহায্য করি। শচীন্দ্রনাথ বছরে কমকরেও আমার

কোম্পানিগুলির কাছ থেকে তিন লাখ টাকার বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকেন।

আত্মপরিচয়ে বদ্রীদাসবাবু বড় কম যান না। বসে বসে সুনীলেশকে সবই শুনতে হল। আত্মপরিচয়ের পালা শেষ হবার পর বদ্রীদাসবাবু সুনীলেশকে বললেন, শচীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি, আপনি খুব ভাল লিখতে পারেন। আমার আন্দোলনটা সম্বন্ধে যদি দু-কলম লিখে দেন তো বড় ভাল হয়।

সুনীলেশ জানত শচীন্দ্রনাথ মাঝখানে রয়েছেন। হয়তো কিছু লিখতে হবেই। ও জিজ্ঞেস করল, আপনার এ-আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি না বদ্রীদাসবাবু। মানুষ মানুষকে সম্মান করে চলবে, এ তো বহু পুরনো কথা। সব ধর্মেই এ কথা রয়েছে।

একটা দোলানো চেয়ারে অধশায়িত অবস্থায় বদ্রীদাসবাবু বলতে লাগলেন, টাকা কামিয়েছি অনেক। এখন সমাজের জন্যে কিছু কাজ করতে চাই। দেশের মানুষের হাল বড় খারাপ। সত্য জিনিসটা দেশ থেকে উধাও হয়েছে। আপনাদের মতো পাঁচজন ভাল লোক সঙ্গে পেলে অনেক কিছু করতে পারতাম। শচীন্দ্রনাথ অবশ্য আমাকে খুব সাহায্য করেছেন।

সুনীলেশ বলল, লিখতে গেলে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সব খবর আমাকে জানতে হবে।

বদ্রীদাস বললেন, আমরা পাঁচজন মিলে প্রথমে প্রতিষ্ঠানটা গড়েছিলাম। এখন সভ্যসংখ্যা অনেক। একটা আপিস নিয়েছি বালিগঞ্জ পাড়ায়। মাইনে করা লোক রেখেছি জনা পঁচিশেক। ওরা প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র বিলি করে। প্রোপাগাণ্ডার জন্যে এরই মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছি।

যে পাঁচজন অবাঙ্গালী ধনী শিল্পপতিদের নিয়ে বদ্রীদাসবাবু আত্মসম্প্রীতি আন্দোলনের শুরু করেছিলেন, তাঁরা সবাই বালিগঞ্জে প্রাসাদোপম বাড়ি করেছেন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছে

এ দের খুব প্রবল। সব সময়ে জঁাদরেল বাঙ্গালীদের সঙ্গে ওঠা বসা করেন। কিন্তু ওঁদের অভিযোগ, তবুও বাঙ্গালীরা ওদের আমল দিতে চান না।

সুনীলেশ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বদ্রীদাসবাবুর কাছ থেকে যতটুকু খবর বের করতে পারল, তাতে বেশ বুঝতে পারা গেল যে, আত্মসম্প্রীতি আন্দোলনটা ওঁদের একটা প্ল্যাটফর্ম, যার ওপর দাঁড়িয়ে জনসাধারণের কাছে ওঁরা পৌঁছতে চান।

সুনীলেশ আন্দোলন সম্বন্ধে দু-চারটে কথা টুকে নেবার পর জিজ্ঞেস করল, বদ্রীদাসবাবু, আজকের প্রেস কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে কিছু হয়তো আপনার বলবার আছে। শচীন্দ্রনাথবাবু আমাকে আপনার সঙ্গে আগেই দেখা করতে বলেছিলেন।

এইবার বদ্রীদাসবাবু পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে শক্ত হয়ে বসলেন। তারপর মিনিট দুই একটু চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ একটা জরুরী ব্যাপারে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি ক্যাল্‌কাটা সুগার ব্যুরো-র সভাপতি। শহরের সব কাগজে চিনির মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযোগ তুলেছে। আজকের প্রেস কন্‌ফারেন্সে ব্যাপারটা কিছু পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই। শচীন্দ্রনাথের কাগজে আমার বিরুদ্ধে এখনও কোনও লেখা বেরোয় নি। কালকের কাগজে আপনাকে এ-সম্বন্ধে একটা ভাল কিছু লিখতে হবে।

সুনীলেশ বলল, পূজো এসে গেছে। চিনির দাম বাড়ছে। এখন কাগজগুলির পক্ষে সুগার ব্যুরো-র সমালোচনা করা ছাড়া উপায় নেই।

বদ্রীদাসবাবু বললেন, কিন্তু বাবুজী, মাল যদি না থাকে তো দাম বাড়বেই। আমি কন্‌ফারেন্সে অনেক তথ্য পেশ করব।

সুনীলেশ কথা বাড়াল না। শুধু ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় খানিকটা সায় দিল।

বেলা তিনটের সময় প্রেস কনফারেন্স শুরু হল। বদ্রীদাসবাবুদের এয়ার কনডিশনড সম্মেলন কক্ষে শহরের সব কাগজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। চা-পানের ব্যাপক আয়োজন ছিল। সম্মেলন আরম্ভ হবার পূর্বেই বদ্রীদাসবাবুর বক্তব্য ছাপানো পুস্তিকাকারে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হল। খবরের কাগজের জন্য সংক্ষিপ্তসারও করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে প্রতিনিধিদের পরিশ্রম করতে না হয়। সভা আরম্ভ হতেই বদ্রীদাসবাবু উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠ করলেন। তিনি বললেন, যদিও এবার দেশে অনেক বেশি চিনি উদ্বৃত্ত হয়েছে, তা হলেও উৎপাদন খরচ মোটেই কমে নি। শ্রমিকদের বেশি মাইনে এবং অন্যান্য সুখ সুবিধে বাবদ চিনি কলগুলিকে কয়েক কোটী টাকা বেশি খরচ বহন করতে হচ্ছে। এই টাকাটা এইভাবে ব্যয় না হলে জনসাধারণের পক্ষে কিছুটা কম মূল্যে চিনি পাওয়া সম্ভব হত! এ ছাড়া যে কারণে পূজোর ঠিক আগেই মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, সেটা হচ্ছে রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব। বাইরের থেকে কলগুলি কলকাতায় মাল পাঠাতে পারছে না। সুগার ব্যুরো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। এখনও যদি কিছু সংখ্যক বেশি ওয়াগন পাওয়া যেত তাহলে পূজোর সময়ে কলকাতার জনসাধারণকে সস্তা দরে চিনি দেওয়া সম্ভব হত।

বদ্রীদাসবাবু যে এ-কথা বলবেন, তা সুনীলেশ এবং অন্যান্য কাগজের রিপোর্টাররা সবাই জানতেন। তারা সম্মেলনে শুধুমাত্র দু-একটা মামুলি প্রশ্ন করে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে কাগজ দেখেই শচীন্দ্রনাথের মাথায় বজ্রাঘাত হল। স্টাফ রিপোর্টার সুনীলেশ ঘোষ রেলওয়ে আপিস থেকে তথ্য যোগাড় করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে কয়েক হাজার মণ চিনি সুগার ব্যুরোর সভ্যরা রেল থেকে ছাড় করেন নি এবং তার ফলেই চিনির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখাটার শেষে সুনীলেশ একটুখানি শ্লেষের

সঙ্গে লিখেছে, আত্মসম্প্রীতি আন্দোলনের সভ্যরা সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্যে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়।

শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, বছরে তিনলাখ টাকার বিজ্ঞাপন মাঠে মারা গেল। অবশ্য তার সাথে বদ্রীদাসবাবুর সম্প্রীতি আন্দোলনও।

সুনীলেশের ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। তিনি কাগজের মালিক এবং সুনীলেশ ঘোষ তাঁর কর্মচারী। তা হলেও সুনীলেশ হাজার হাজার পাঠকের কাছে নিজেকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। ও যদি আজ শচীন্দ্রনাথের কাগজ ছেড়ে যায়, তা হলে কাগজের প্রচার সংখ্যার ব্যারোমিটার ধপ করে অনেকটা নীচে নেমে যাবে।

বাংলাদেশের দৈনিক কাগজের পাঠকদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাদের সুখ-সুবিধের কথা না লিখলে তারা কাগজ পড়বে না। আর, একবার যদি প্রচার সংখ্যা কমে যায়, তাহলে বিজ্ঞাপনদাতারা পিছু হঠবে। কাগজের মালিকদের পক্ষে এ এক বিরাট সমস্যা। তাই অনিচ্ছাসত্বেও সুনীলেশের মতো অনেক অবাধ্য কর্মচারীকে তাঁদের পুষতে হয়।

সুনীলেশকে হারানোও যেমন যায় না, তেমনি আর্থিক ক্ষতি হলেও চুপ করে থাকা যায় না। তাই সুনীলেশ আপিসে আসতেই ওকে ডেকে পাঠিয়ে শচীন্দ্রনাথ নরমে গরমে একটুখানি রগড়ে দিলেন। বললেন, সুনীলেশ তুমি বদ্রীদাসবাবুর বিরুদ্ধে লিখেছ তাতে কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু তুমি ওদের এমন কতকগুলি তথ্য ফাঁস করে দিলে, যাতে বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে আমার মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে। তাতেও আমার আপত্তি ছিল না, যদি আমাকে বছরে তিন লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন হারাতে না হত। তুমি তো জানতে, ওর কোম্পানিগুলির কাছ থেকে কত টাকার বিজ্ঞাপন আমার কাগজ পেয়ে থাকে।

সুনীলেশও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। ও আগেই বুঝতে পেরেছিল যে শচীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। ও বলল, স্যার, আমার পক্ষে উপায় ছিল না। বদ্রীদাসবাবুদের মতো লোকদের দেশের মানুষের সামনে তুলে না ধরলে আমার কর্তব্যহানি ঘটবে। সাংবাদিক হিসেবে আমার যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

শচীন্দ্রনাথের পক্ষে উত্তর দেওয়া মুশকিল হল। কিন্তু টাকার শোক ততক্ষণ ওঁকে পেয়ে বসেছে। উনি বললেন, বদ্রীদাসদের তুলে ধরতে গিয়ে আমাকে যে একেবারে মাটিতে ফেলে আছড়ে দিলে! একটা মধ্যপথ বেছে নিলে কি তোমার চলত না! অন্তত হাওড়া গুডস্ শেড-এর খবরটা চেপে গেলেই তো হত!

তারপর শচীন্দ্রনাথ বদ্রীদাসবাবুর আত্মসম্প্রীতি আন্দোলনের কথায় এলেন। সুনীলেশ ও-বিষয়টা একেবারেই চেপে গিয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, চিনির খবর ছেপে বদ্রীদাসের যে ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা যদি পুষিয়ে দেওয়া যায়, তবুও হয়তো শেষ পর্যন্ত মুখরক্ষা সম্ভব হবে। তাই সুনীলেশের কাছে তিনি কথাটা পাড়লেন। কিন্তু এ-ব্যাপারেও তিনি তখন সুনীলেশের সহযোগিতা পেলেন না।

শচীন্দ্রনাথ মনমরা হয়ে চোখবুঁজে হাঁটু নাড়তে নাড়তে বললেন, হয়তো তোমার প্রতিভা আছে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিশক্তি নেই। তুমি আমাকে ডোবাবে সুনীলেশ! বরাবর তোমাকে বলেছি, দুটো পয়সার জন্যে……

সুনীলেশকে নিয়ে এরকম সমস্যা শচীন্দ্রনাথের এই প্রথম নয়। অনেকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। সুচতুর শচীন্দ্রনাথ কোনও বারই স্টাফ রিপোর্টার সুনীলেশের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেন নি। দুজনের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ হয়েছে প্রচুর। মন কষাকষিও হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবার শচীন্দ্রনাথই নরম হয়ে বলেছেন, সুনীলেশ তোমার প্রিন্সিপলগুলো বড় ইন্‌ইলাষ্টিক।

সুনীলেশকেও বহুবার নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখতে হয়েছে। চাকরি করতে গেলে প্রত্যেকবারই তো আর মালিকের বিরুদ্ধাচারণ করা সম্ভব নয়! কিন্তু তাহলেও ও কোনও দিনই সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করে নি। নিজে কিছুটা ছেড়েছে এবং শচীন্দ্রনাথকেও কিছুটা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

হালে সুশান্তও সুনীলেশের দলে এসে জুটেছে। সুনীলেশ তবু কথার উত্তর দেয় তর্ক করে; সুশান্ত কথাই বলেন না। যখনই শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর মতানৈক্য ঘটেছে, তখনই উনি সেরেফ নীরব হয়ে গেছেন। শচীন্দ্রনাথ বলতেন, দোহাই মশাই, আপনার বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বলুন। কিন্তু সুশান্ত অত্যন্ত আত্মসচেতন মানুষ। একবার যদি বুঝতে পারতেন যে অপর পক্ষের উল্টোতর্ক অজ্ঞানপ্রসূত নয়, স্বার্থপ্রসূত, তখনই তিনি নীরব হয়ে যেতেন। সুনীলেশও ওঁকে অনেকবার এর কারণ জিজ্ঞেস করেছে। প্রতিবারই সুশান্ত উত্তর দিয়েছেন, যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কেউই ভাঙাতে পারে না।

একদিন মুরারি ঘোষ শচীন্দ্রনাথকে টেলিফোন করে জানালেন, ওদের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ভারতের সীমান্ত নিয়ে অত্যন্ত জরুরী খবর পরিবেশন করেছিল, অথচ ওঁর কাগজে সেটা ছাপা হয় নি। এরকম খবরগুলোও যদি না ছাপা হয়, তাহলে তো মহা-মুশকিলের কথা!

শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুরারিবাবুর একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে, অন্তত সীমান্ত এলাকার খবরগুলি ওঁর কাগজে ছাপা হবে। শচীন্দ্রনাথ সানন্দে রাজী হয়েছিলেন। একে তো খবরের জন্যে একটা পয়সাও দিতে হয় না, তাছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যাপারে উনি মুরারি ঘোষের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছিলেন। তিনি বার্তা বিভাগে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন।

মুরারি ঘোষের টেলিফোন পেয়েই শচীন্দ্রনাথ খোঁজ নিয়ে জানলেন সেদিন সুশান্ত বসু ডিউটিতে ছিলেন। সুশান্তর ডাক পড়ল। সুশান্ত বললেন, খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় উনি ওটা দেন নি। শচীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, নিউজ ডিপার্টমেন্টের ওপর আমার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল; আপনি তা ভঙ্গ করেছেন।

সুশান্তও খেপে গিয়ে বললেন, সাব-এডিটরদেরও ডিস্‌ক্রিসান্‌ বলে একটা জিনিস আছে। আর তাছাড়া আজগুবী খবর না ছাপাই কাগজের পক্ষে মঙ্গল। এ ধরনের দু-একটা খবরের কনট্রাডিক্‌সান্‌ বেরুলে, পাঠকদের মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, পাঠকদের মতামতের দিকে তাকিয়ে আমাদের চলতে হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজন বোধে আমাদের মতও যাতে পাঠকরা গ্রহণ করে, তা দেখাও তো আমাদের কর্তব্য।

সুশান্ত বললেন, জেনেশুনে বাজে খবর পরিবেশন করা প্রচার হতে পারে, কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। আর তাছাড়া পাঠক সাধারণের বুদ্ধি সম্বন্ধে খবরের কাগজ কর্তৃপক্ষের আরও একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁরা হয়তো সব সময়ে প্রতিবাদ করে না, তাহলেও তাদের মনের গভীরে আস্তে আস্তে একটা অবিশ্বাসের জট পাকাতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া একদিন হতে বাধ্য।

শচীন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে লাগল।

সুনীলেশ যদি একবার বুঝতে পারত যে শচীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়েছেন, তাহলে চুপ করে যেত। কিন্তু সুশান্ত অত্যন্ত একগুঁয়ে ধরনের লোক। কোনও জিনিস সম্বন্ধে না জেনেশুনে তিনি কখনই কিছু বলতেন না। আর একবার কিছু বললে তা কখনই প্রত্যাহার করতেন না।

শচীন্দ্রনাথ একটু উচ্চ কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কাগজখানা আমার। পলিশিটাও আমিই স্থির করব, নয় কি?

সুশান্ত বললেন, নিশ্চয়ই স্যার। চাকরিটাও আমিই করছি। চাকরি করা না করার ইচ্ছাটাও আমার।

শচীন্দ্রনাথ বুঝলেন, আবহাওয়া উষ্ণ হয়েছে। সুশান্তর প্রয়োজনীয়তাও কাগজের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি হঠাৎ মেজাজটা অস্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা করে বললেন, সুশান্তবাবু, আপনি এবং সুনীলেশ কাউকেই আমি বোঝাতে পারলাম না যে আমি ব্যবসায়ী। আমাকে চারিদিক দেখেশুনে পথ চলতে হয়। আমি দুটো পয়সা রোজগার করবার জন্যেই এখানে বসেছি।

মাধবী একদিন সুনীলেশের আপিসে টেলিফোন করে বসল। অনুরোধ করল, একদিন ওদের বাড়িতে যেতেই হবে।

সুনীলেশের ইচ্ছা ছিল এর মধ্যে একবার গিয়ে দেখা করে আসে। অনেকদিন যাবার কথা ও ভেবেছে, কিন্তু মাধবীর হিস্টিরিয়া হয়েছে জানতে পারা অবধি ওর যেন কেমন লাগত। শেষবার ছাদের বারান্দায় থামের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবীর সংজ্ঞাহীন হওয়ার কথাটা সুনীলেশের আজও মনে পড়ে। ব্যাপারটা বড়োই বেদনাদায়ক। একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ের বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এই পরিণতি অচিন্তনীয়। ভাবলেই সুনীলেশের মন খারাপ হয়ে যায়। যখনই মাধবীর কথা মনে পড়ে, তখনই ওর সংজ্ঞাহীন চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু আজ মাধবী যখন নিজে ফোন করল তখন ও আর না গিয়ে পারল না।

মাধবীকে দেখে বড়ো আনমনা মনে হচ্ছিল। আজও মাধবী হাসল, বসতে বলল, কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করল। তবুও কোথায় যেন কি হারিয়ে গেছে। ওকে যেন বড্ড বেশি নির্লিপ্ত মনে হচ্ছিল।

সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল, তোমার শরীর কেমন মাধবী?

মাধবী বলল, বসুন। কর্তা বিলাসপুরে আছেন। ডাক্তার এখনই আসবেন। সব শুনতে পাবেন। শরীরের অবস্থা ভালো নয়।

সুনীলেশ গম্ভীর হয়ে চেয়ারের উপর বসে ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিল। এর শেষ কোথায় ?

সুনীলেশকে নিরুত্তর দেখে মাধবী বলল, সুনীলেশদা, বিদ্যাধরদা এর মধ্যে একদিন এসেছিল। ওর কাছে শুনলাম আপনার নাকি আজকাল খাওয়দাওয়া কমে গেছে। শরীরও নাকি মোটেই ভালো নেই ?

সুনীলেশ বলল, শরীরের আর দোষ কি বল ? খবরের কাগজে চাকরি করি, কোথায় কখন থাকি, খাই ঠিক নেই।

মাধবী একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? রাগ করবেন না তো ?

সুনীলেশ উত্তর দিল, নির্ভয়ে বলতে পার।

মাধবী খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, সুনীলেশদা আপনি বিয়ে করেন নি কেন ?

সুনীলেশ এবার না হেসে পারল না। এ-প্রশ্নের জবাব জীবনে কত হাজার লক্ষবার যে দিতে হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রশ্নটার উত্তরই বা কী ? সত্যিই কি এর কোনও জবাব দেওয়া সম্ভব ? আপাতদৃষ্টিতে অনেক কারণবিহীন ঘটনা জীবনে ঘটে থাকে। যেগুলো যুক্তির বিচারে টেকে না ; কিন্তু তবুও সেগুলো ঘটে। ও বলল, কেন করি নি, বলতে পারি নে, তবে করি নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

মাধবী বলল, আমি জানি কেন বিয়ে করেন নি।

সুনীলেশ এবারও মৃদু হেসে জবাব দিল, বেশ তো, যদি জানই তো বল না !

মাধবী বলল, খুঁত ধরতে ধরতে কখন যে এত বয়স হয়ে গেছে টের পান নি।

সুনীলেশ হেসে জবাব দিল, কথাটা খানিকটা পরিমাণে সত্য। কিন্তু সবটা সত্য নয়।

মাধবী জবাব দিল, খুঁত না ধরাই ভাল— জীবনে যা চাওয়া যায় তা পাওয়া বড়ো মুশকিল!

কথাটা বলবার পরই হঠাৎ মাধবীর মধ্যে সেদিনকার মতো সংজ্ঞাহীন হবার লক্ষণগুলি দেখা যেতে লাগল। প্রথমে ওর চোখদুটো স্থির হয়ে এল, তারপর শরীরটা একটুখানি দুলে শক্ত হয়ে গেল।

সুনীলেশ মাধবীকে ধরে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল, মাধবী! মাধবী! উত্তর নেই। এইমাত্র যে-মানুষটি হেসে হেসে কথা বলছিল, হঠাৎ সে কোথায় যে হারিয়ে গেল তার ঠিক নেই। এ যেন জীবনের সাথে মাধবীর লুকোচুরি খেলা।

সুনীলেশ বাড়ির কাউকে ডাকবে বলে উঠে বারান্দায় যেতেই দেখতে পেল, একজন কর্মচারীর সঙ্গে ডাক্তার উপরে উঠে আসছেন।

সুনীলেশ এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে খবরটা দিল। ডাক্তার কিন্তু কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন না। যেন কিছুই হয় নি। তিনি আস্তে আস্তে গিয়ে মাধবীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর নাড়ীটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর সামনের চেয়ারটা টেনে বসলেন।

সুনীলেশ এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের সামনে বসে মাধবীর অসুখ সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগল। ডাক্তার বললেন, ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে যা হয় তাই। এর কোনও ওষুধ নেই। তবে একটি সন্তান হলে হিস্টিরিয়াটা থাকত না। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।

রোগিনীর অবস্থার উন্নতি কদ্দিনে হওয়া সম্ভব, সুনীলেশের এই প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার বললেন, বলা মুশকিল। রোগিনী যদি দুর্বল হয়ে পড়েন, তাহলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন। আবার ঠিক এই অবস্থায়ও সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারেন। এখন কিছু বলা মুশকিল।

দু-চারটে কথা বলে ডাক্তার চলে গেলেন। মাধবী ততক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছে। জ্ঞান ফিরে পেতেই ও ভয়ানক লজ্জিত বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে চোখমুখ ধুয়ে এসে আবার সুনীলেশের কাছে বসল। সুনীলেশ জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে?

মাধবী বলল, আমার কখনও খারাপ লাগে না।

সুনীলেশ বলল, ডাক্তার সেনের সঙ্গে আলাপ হল।

মাধবী মৃদু হেসে বলল, তিনি কি কি বললেন? আমার স্বামী বৃদ্ধ, তাই এ রোগ হয়েছে এই তো?

সুনীলেশ বলল, অনেকটা তাই।

মাধবী এইবার একটু গম্ভীর গলায় বলল, হোক্ আমার এ রোগ —শতবার সহস্রবার হোক্। তবুও তো বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিয়ে করে আমায় সংসারে বেঁচে থাকবার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন! আমার বিয়ে না হলে বেচারা মামা হয়তো এ্যাদ্দিন আত্মহত্যা করতেন। সত্যিই বলছি সুনীলেশদা, স্বামীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কথাগুলো বলে মাধবী পরিশ্রান্ত বোধ করছিল।

ওর মনের মধ্যে যে নিদারুণ সংগ্রাম চলছিল, তার খবর কেউ রাখত না। হিস্টিরিয়া হওয়া অবধি ডাক্তার থেকে শুরু করে সবাই একই কথা বলছে। যেন সব-কিছুর জন্যে মাধবীই দায়ী। যেন সমাজের শতসহস্র দয়ালু যুবক ওর স্বয়ংবরা সভায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু ও তাদের সব হটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গলায় মাল্যদান করেছে।

একটুখানি চুপ করে থেকে ও বলল, সুনীলেশদা, অসুখ আমায় যতটা না কাবু করতে পেরেছে, তার চাইতে বেশি কাবু করেছে পাঁচজনের সমবেদনা। সবাই এখন আমার অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি এক করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি।

সুনীলেশের পক্ষে একথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না। মানুষের

এমন অনেক করুণ মুহূর্ত আসে যখন যুক্তি তর্ক পথ হারিয়ে ফেলে। মাধবীর জীবনের ট্র্যাজেডি ওকে হতবাক্‌ করে দিয়েছিল।

মাধবী আবার স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। ও বলল, যদি সত্যিকারের দুঃখ কেউ পেয়ে থাকে আমার জন্যে, তো সে আমার স্বামী। কষ্ট হয় তাঁর জন্যে। একটা ভুল করে তার জন্যে যে-মাশুল তাঁকে দিতে হচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারি। ভদ্রলোক কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমার কাছে যখনই আসেন, তখনই অপরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর অপরাধের জন্যে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। ইচ্ছে হয় তাঁকে ডেকে চিৎকার করে বলি— তোমার সব অপরাধের বোঝা আমাকে দাও।

সুনীলেশ বসে বসে ভাবছিল, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা মাধবীর জীবনে প্রায় ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে-ভালোবাসার প্রকৃত রূপ আলাদা। যে-বৃদ্ধ হয়তো ওর পিতা হতে পারত, তার প্রতি দরদভরা মমতায় মাধবীর মন বেদনামুখর হয়ে উঠেছিল। এও মানুষের জীবনের একটা অদ্ভুত প্রকাশ। যে-প্রকৃতি সুযোগ এবং সময়ের অভাবে সঠিক পথে চলতে পারে না, হঠাৎ সে রূপ বদলে অন্য এক প্রবৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করে। মাধবীর জীবনে স্বামীর প্রতি যে আপাত ভালোবাসা, তা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা নয়; মনের অসংখ্য অলিগলি বেয়ে সেটা অন্য এক রূপ ধারণ করেছে। বাইরের লোক দেখলে ভাববে, সত্যিই বুঝি মাধবী ওর স্বামীকে ভালোবাসে।

সুনীলেশের মনে আরও একটা চিন্তা বাসা বেঁধেছিল। মাধবীর প্রতি স্বামীর যত কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসাই থাকুক না কেন, ওর মন কি ব্যাপারটাকে সহজ ভবে গ্রহণ করতে পারবে? যদি না পারে তাহলেই আসল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

কলকাতার জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করল'। তা না হলে হাজারীবাগ জেলার অরণ্যপ্রান্তের একজন অখ্যাত রিকশাওয়ালাকে জানত কে? আজও যে ওকে কেউ মনে রাখবে তার বিন্দুমাত্র কোনও কারণ নেই— কিন্তু তবুও তো ওর নাম অসংখ্য পাঠকের কাছে পৌঁছেছে!

ত্রিশ বছর আগে হাজারীবাগের একটা জঙ্গল-ঘেরা ছোট্ট গ্রামে সুন্নৎ কাহার জন্মেছিল। জঙ্গলের চিতা, হরিণ, পাইথন দেখে দেখে সুন্নৎ বালক থেকে যখন কিশোরে পরিণত হল, তখন বাপ বলল, এখন বড়ো হয়েছ, গরু, ভেড়া চড়িয়ে যা পার রোজগার করে সংসারে দাও।

সেই অরণ্যসঙ্কুল প্রান্তরে গরু, ভেড়া চড়িয়ে আর কদিন চলে? কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জীবনের ধারা বয়ে চলে। সুন্নতের বয়েস যখন পনেরো, তখন আর এক গ্রামের ত্রয়োদশী সুতিনার সঙ্গে বাপ ওর বিয়ে দিল। বিয়ের পরই সুতিনা কপালে সিঁদুর চড়িয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। সুন্নৎ যখন যুবক হবে, তখন যৌবনের নূপুরনিক্কনে স্বামীগর্বে গর্বিতা সুতিনা ওর ঘর আলো করতে আসবে।

হলোও তাই। সুন্নতের বয়েস যখন তেইশ, তখন সুতিনা ওর ঘর করতে এল। তদ্দিনে বাপ বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। উপযুক্ত পুত্র তখন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে শহরে বিক্রি করা শুরু করল। সকালে চারটি কিছু খেয়ে সুন্নৎ কুড়ুল হাতে করে জঙ্গলে ঢুকত। সঙ্গে থাকত সুতিনা। সুন্নৎ যখন গাছের ডগায় বসে ডালপালা কাটত তখন নববধূ তলায় একটা টাঙী হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকত। সুন্নৎ বলত— সুতিনা, সাবধানে কাঠ কুড়োস্। এ-বনের চিতাগুলো বড্ড সাংঘাতিক। সুতিনা তলায় দাঁড়িয়ে বলত, আমার জন্যে তোর ভয় করতে হবে না; আমি বাঘের সঙ্গে লড়তে জানি। তুই সাবধান; আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গাছ থেকে পড়ে যাস্ নি। সুন্নৎ উপর থেকে বলত—তুই বড়ো বেইমান্।

তারপর একদিন সুন্নতের বুড়ো বাপ মারা গেল। মা তো আগেই চলে গিয়েছিল। এর মধ্যে সুতিনার একটি ছেলেও হয়েছে। নাম রেখেছে পোট্‌না কাহার।

সেবার হাজারীবাগ জেলায় ক্রমাগত তিন বছর বৃষ্টি হল না। খেত গাছপালা সব শুকিয়ে গেল। ওদিকে দেশে বনমহোৎসব শুরু হয়েছে। সরকারবাহাদুর ও অঞ্চলের সমস্ত জঙ্গল এলাকায় কাঠ কাটা আইন করে বন্ধ করে দিলেন। সুন্নতের কাঠ বেচা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল।

সুতিনা বলল, বড়ো বিপদে পড়লাম। যত দায় হয়েছে পোট্‌-নাকে নিয়ে। ওকে যদি না খাওয়াতে পারি, তা হলে উপায় কি হবে?

একদিন রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে সুন্নৎ সুতিনার কাছে এক অদ্ভুত গল্প বলল। কলকাতা বলে একটা প্রকাণ্ড শহর আছে। সেখানে মানুষরা পায়ে হেঁটে চলে না। যারা বড়লোক তারা হাওয়াই গাড়িতে চড়ে, আর যারা গরিব তারা চড়ে রিকশায়। রিকশাটানার কাজ খুব ভালো। মালিকের ভাড়া জমা দিয়েও রোজ টাকা-দুই থাকে। আধ্‌না গ্রামের বুধন মাহাতো কলকাতায় রিকশা টানে। বছরে একবার ঘরে আসে। ওর অবস্থা ফিরে গেছে।

সুতিনা বলল ওর কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু সুন্নৎকে একা কিছুতেই কলকাতা যেতে দেবে না।

সুন্নৎ বলল, কলকাতায় রিকশাওয়ালারা দিনে রিকশা টানে, আর রাত্রিবেলা রাস্তায় শুয়ে থাকে।

সুতিনা বলল, যদি অসুখ হয়?

সুন্নৎ উত্তর দিল, তা হলেও রাস্তায়।

সুতিনা বায়না ধরল ওকেও তা হলে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। দুজনেই রাস্তায় থাকবে।

সুন্নৎ বলল, দূর পাগ্‌লী।

ঠন্‌ঠনিয়া, তালতলায় যত রিকশাওয়ালা থাকে, সবাই প্রায় সুন্নতের দেশের লোক। পেটের দায়ে দেশ ছেড়ে এসে কলকাতায় রিকশা টানছে। কেউ-বা বরাত জোরে একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেয়েছে, নয়তো ওদের প্রায় সবাই ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যের পর ফুটপাথের এককোণে গোল হয়ে বসে ওদের সুখ-দুঃখের আলাপ হয়। দেশের কথা আলাপ করতে বড়ো ভালো লাগে। বছর কাবার করে কারুর দেশে যাবার সময় হলে, সে কি বিরাট ব্যাপার! জন পঞ্চাশ মিলে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে ভালোবাসা জানায়। সেই মুহূর্তে রেলগামী সেই প্যাসেঞ্জার শুধুমাত্র তার নিজের গ্রামে বালবাচ্চাকে দেখতেই যাচ্ছে না; যারা দূরে পড়ে রইল, তাদের প্রতিনিধি হয়েও চলল। হাজারীবাগের আকাশ-বাতাসকে সে ডাক দিয়ে বলবে, তোমার দেশের মানুষরা তোমাকে ভোলে নি। তারা সবাই ভালোই আছে।

বছর-দুই সুন্নৎ, সুতিনা আর পোট্‌নার চলল ভালোই। তার পরেই শুরু হল হাড়ভাঙ্গা খাটুনির প্রতিক্রিয়া। খুক্‌ খুক্‌ কাশি আর অল্প অল্প জ্বর। সুন্নৎ গ্রাহ্যও করে না। হাজারীবাগের অরণ্যঘেরা গ্রামের বীর ছেলে সে— অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু ভয় না পেলে কি হয়? শরীর আস্তে আস্তে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বুধন মাহাতো একদিন ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ভালো ভালো জিনিস খাবে, আর ছ-মাস রিকশা টানবে না।

ততদিনে সুন্নতের রিকশা টানবার মত তাকতও আর রইল না।

পাহাড়ী মেয়ে সুতিনা ভিক্ষায় পসার জমাতে পারল না। ওরা মানুষের কাছে কখনও হাত পাতে নি। ওদের পক্ষে গভীর অরণ্যানীর

মধ্যে বাঘ, ভালুকের সঙ্গে মোকাবিলা করা বরং সহজ। জীবন দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই জানে, কিন্তু কারুর কাছে হাত পেতে ইজ্জৎ কখনও হারাতে শেখে নি।

পোট্‌নাকে একদিন বসে কাঁদতে দেখে অসুস্থ সুন্নতের মেজাজ চড়ে গেল। ও সুতিনাকে গালমন্দ করল। সুতিনাও অরণ্যকন্যা। দু-চার কথা শুনিয়ে দিল। কিন্তু সেইদিনই দুজনের মধ্যে শেষ কথা কাটাকাটি, শেষ ঝগড়া। সন্ধ্যের পরে সুতিনা পোটনাকে একটা বাটিতে চারটি মুড়ি খেতে দিয়ে সেই যে পালাল আর ফিরল না।

তারপর সুন্নতের শুরু হল জীবন-মরণ সমস্যা। ওর শরীর তখনও অসুস্থ। কিন্তু তবুও পোট্‌নাকে একা ফেলে রেখে আবার রিকশা নিয়ে বেরুতে হল। দু-একদিন বেরুতেই আবার মুখ দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হল। বুধন বলল, সুতিনা চলে গেছে বলে কি তুই মরতে চাইছিস্? তুই মরদের বাচ্চা নস্? একটা জেনানা গেছে তো হয়েছে কি! ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো?

কিন্তু সুন্নৎ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে রিকশাটাকে জমা দিয়ে বাসায় ফিরে সুন্নৎ দেখে পোট্‌না ভীষণ চিৎকার করে কাঁদছে। ওর দোষ নেই। তার আগের দিন সারা রাত্রিরে একটা দানাও পেটে পড়ে নি। আর তাছাড়া আজকাল কান্না শুরু হত খিদে নিয়ে, আর শেষ হত মাকে নিয়ে। শুধু কাঁদত আর বলত, মা কোথায়; আমায় মায়ের কাছে নিয়ে চল।

এক মুহূর্তের মধ্যে সুন্নৎ কাহারের আদিম রক্তে অরণ্যের হিংস্রতা নেমে এল। ও পোট্‌নাকে হিড় হিড় করে ফুটপাথের ওপর টেনে নিয়ে এসে তুলে মারল এক আছাড়। দু-হাত দূরে পোট্‌নার রক্তাক্ত দেহটা দু-চার বার নড়ে স্থির হয়ে গেল। পাড়ার শুভানুধ্যায়ীরা এলেন। পুলিশ এল। সুন্নৎ কাহারের হাতে হাতকড়ি পড়ল। সুনীলেশ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুল, তখনও পোট্‌নার মৃতদেহটা সরানো হয় নি। ও ভালো করে তাকিয়ে

দেখল, পোট্‌না্র মৃতদেহটা যেখানে পড়ে আছে ঠিক তারই পেছনে দেয়ালের গায়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটা ছাপানো পোস্টার সাঁটা রয়েছে। তাতে রয়েছে গত পাঁচ বছরে দেশের লোকের শতকরা আয় কতটা বেড়ে গিয়েছে, তার নির্ভুল পরিসংখ্যান। পোস্টারটার দিকে চেয়ে চেয়ে সুনীলেশ তখন ভাবছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সবচাইতে নির্ভুল পরিসংখ্যান হল আড়াই বছরের পোট্‌না কাহারের মৃত্যু।

মাত্র মাস তিনেকের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ এমন ভাবে বদলে যাবে, সুনীলেশ কল্পনাও করতে পারে নি। সেদিন সুনীলেশ আপিস থেকে কেবল ফিরেছে, এমন সময়ে বিদ্যাধর খবর দিল মাধবীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই মর্মান্তিক খবরের জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। বিদ্যাধর খবরটা দিয়েই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। সুনীলেশের পা অসাড় হয়ে এল। ওর মনে হল ঘরের দেওয়ালগুলি যেন ওর চারিদিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

নিঃশব্দে খাটের ওপর সুনীলেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। তারপর বিদ্যাধরের দেওয়া এক কাপ চা কোনোরকমে এক চুমুকে শেষ করে মাধবীর বাড়ির দিকে রওনা হল। যাবার আগে ছাদের বারান্দার সেই থামটার কাছে একবার দাঁড়াল, যেখানে মাধবী এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াত। আর একবার তাকাল রজনীগন্ধার সেই টবটার দিকে। টবটা খালি। রজনীগন্ধার চারাগাছ আর লাগানো হয় নি। ভালোই হয়েছে, সুনীলেশ ভাবল, গাছটা ওখানে থাকলে মাধবীর স্মৃতিটা আরও সজীব হয়ে থাকত।

সেদিন মাধবীদের বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড়। আশুতোষ-বাবুর আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন। মাধবীর মামা ছাড়া আর কেউ

নেই। তিনিও এসেছেন। সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। কেউ কথা বলছে না। নেপালী দারোয়ান আজ অনেক উদার। কাউকে ওপরে যেতে বাধা দিচ্ছে না।

স্থনীলেশকে দেখেই সেলাম ঠুকে দারোয়ান বলল, মাইজী পাগলী হো গয়ি। আজ উনকো রঁাচী মে ভেজা রহা হৈ।

বাইরের ঘরে ঢুকেই স্থনীলেশের প্রথমে দেখা হল মাধবীর মামার সঙ্গে। তিনি মাথা নিচু করে বসে কাঁদছিলেন। ঠিক তারই পাশে মাথা নিচু করে বসেছিলেন মাধবীর স্বামী। মাধবীর জীবননাট্যে আজ ওরাই দুজন অপরাধীর অভিনয়ে নেমেছেন। স্থনীলেশ ভাবছিল অপরাধী সবাই, সমস্ত সমাজ অপরাধী। কিন্তু তবুও মামলা করতে হলে আসামী সাব্যস্ত করতে হয়। এ-মামলায় দুজন আসামী। প্রধান আসামী কাঠগোলার ব্যবসায়ী শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

স্থনীলেশকে দেখে মাধবীর মামা উঠে এগিয়ে এলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, স্থনীলেশবাবু এসেছেন? যান, মাধবীকে দেখে আস্থন। কম্পিত আবেগে উনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

মাধবীর স্বামী বললেন, দিন-পাঁচেক আগে প্রথম লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। আজ দুদিন হয় একেবারে পাগল হয়ে গেছে। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, এ আমি কি করলাম স্থনীলেশবাবু?

স্থনীলেশ কথার জবাব দিল না। ও সটান চলে গেল মাধবীর ঘরে। আশুতোষবাবুর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর সেই ডাক্তার বসে ছিলেন ঘরের মধ্যে। বিছানার ওপর মাধবী শুয়ে রয়েছে। হাত এবং পা বাঁধা।

মাধবী কয়েক মিনিট পরে চোখ খুলল। স্থনীলেশ ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ খুলে চাইতেই স্থনীলেশ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, মাধবী, এখন কেমন লাগছে?

মাধবী একটুখানি হাসল।

সুনীলেশ আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার কেমন লাগছে?

মাধবী এবারও হাসল। কিন্তু এত জোরে যে ওর হাসির তোড়ে সমস্ত ঘরটা কাঁপতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, ওঁর মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই শুধু হাসছেন।

সুনীলেশ সাংবাদিক। বহু করুণ ঘটনা ওকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে; দেখতে হয়েছে বহু মৃত্যু, বহু ভালোবাসার অন্তিম ট্রাজেডি, বহু প্রতারণা, বহু হৃদয়হীনতা। কিন্তু আজ ও এক নতুন মৃত্যু দেখল। বেঁচে থেকেও সব কিছুকে নীরবে অতিক্রম করে যাওয়া—আলো-আঁধারের খেলা থেকে বহুদূরে চলে যাওয়া, যেখানে দার্শনিক, সাংবাদিক এমন কি চিকিৎসকও পৌঁছতে পারেন না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মাধবীর রাঁচী যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল। ট্রেনের একটা পুরো কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে। সঙ্গে ডাক্তার, একজন নার্স, আরও দুজন সঙ্গী। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাধবীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে অ্যাম্বুল্যান্স এল। একখানা টুকটুকে লাল রঙের শাড়ি পরিয়ে মাধবীকে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গাড়িতে তুলল। মাত্র বছর-দেড়েক আগে শীতের এক কুহেলিকাময় সন্ধ্যায় লাল চেলি পরে এক অবগুণ্ঠনবতী মাধবী এ-বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। আজও একখানা লাল শাড়ি পড়ে অবগুণ্ঠনবতী মাধবী এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তবে সেদিনকার অবগুণ্ঠন ছিল দামী সিল্কের ওড়নার; আর আজকের অবগুণ্ঠন বিস্মৃতির।

বদ্রীদাসবাবুদের মতো ব্যক্তিদের পয়সা এমনিতে হয় না। কি নিদারুণ অধ্যবসায়, তিতিক্ষা এবং চক্ষুলজ্জার অভাব থাকলে যে মানুষ অর্থ রোজগার করতে পারে তার ঠিক নেই। সেই চিনি

সংক্রান্ত ঘটনাগুলি কাগজে প্রকাশ করে দেবার পর সুনীলেশ ভেবেছিল, অন্তত বদ্রীদাস বাবুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

কিন্তু তা হল না। আবার ভদ্রলোক এলেন। এবার খোদ কর্তার ঘরে সুনীলেশের ডাক পড়ল। সুনীলেশ শচীন্দ্রনাথের ঘরে বদ্রীদাসবাবুকে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তিনিই প্রথমে ঘরের আবহাওয়াটকে স্বাভাবিক করে বললেন, আসুন সুনীলেশবাবু, আসুন। আপনার মালিকের সঙ্গে আপনার কথাই হচ্ছিল।

সুনীলেশ তাকিয়ে দেখল শচীন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসছেন। বদ্রীদাসবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি তো চিনি নিয়ে আমার সত্যনাশ করে দিলেন বাবুজী— এবার আমাদের সম্প্রীতি আন্দোলন সম্বন্ধে ভালো করে কিছু লিখে দিন। ওর মধ্যে তো আর 'ব্ল্যাক' নেই। বলেই তিনি হাসতে লাগলেন।

সুনীলেশ চুপ করে রইল। শচীন্দ্রনাথের সামন ওঁর বন্ধুকে কিছু বলা মুশকিল।

শচীন্দ্রনাথই বললেন, বদ্রীদাসবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওটা নিয়ে নিশ্চয়ই সুনীলেশ দু-এক কলাম লিখে দেবে।

তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দু-চারটা আলাপ করবার পর বদ্রীদাসবাবু উঠতে চাইলেন। শচীন্দ্রনাথ বললেন, এত তাড়াতাড়ি?

বদ্রীদাস উঠে পড়ছিলেন। আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, এখন যাচ্ছি আমার ফিল্ম কোম্পানিতে। সেখানে উষা চৌধুরী আসবেন।

সুনীলেশের কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, শুনেছি বটে মেয়েটির নাম। আজকাল নাকি ইনিই ওপরে উঠছেন।

বদ্রীদাস বললেন, ওঠা আর পড়া, কতই যে দেখলাম তার ঠিক নেই। উষা চৌধুরী বছর দেড়েক ফিল্ম-এ নেমেছেন। কয়েকখানা বইতে হিরোইন হয়েছেন। এখন ওঁর রেট দশ হাজার টাকা। কিন্তু

বেচারা যা-কিছু রোজগার করেছিল সব যাবার মুখে। ডিরেক্টর জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে পার্টনারশিপ-এ একখানা বই করতে গিয়ে সব টাকাটাই নষ্ট হয়েছে। জ্যোতিষবাবুর এক পয়সাও যায় নি। আমি ছবিখানার ডিস্ট্রিবিউটর ছিলাম। পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স করেছিলাম। উষাদেবীর হাজার তিরিশেক দেওয়া ছিল। বইটা একদম flop হয়ে গেছে।

সুনীলেশ বলল, তারপর?

—তারপর আর কি, যা হবার তাই হয়। উষাদেবী নিউ আলিপুরে একটা জায়গা কিনেছিলেন হাজার পনেরো টাকা দিয়ে। আমার মাসতুত ভাই ঘনশ্যাম তার স্টুডিও ভাড়া বাকী বাবদ জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে। কাল রেজিস্ট্রি হবে। আজ বিকেলে উষাদেবী জমির দলিল নিয়ে আমার আপিসে আসবেন।

তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বদ্রীদাসবাবু আবার বললেন, কি দরকার ছিল মশাই এ-লাইনে আসবার? শুনেছি ভদ্রমহিলা অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। দেখতেও তো খুব খাপসুরত।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, তাই বলেই তো এ-লাইনে এসেছেন। এত টাকা রোজগার আর কোন্ লাইনে হয়?

বদ্রীদাসবাবু বললেন, যতটুকু দেখেছি, মেয়েটি খুব ভালো। তবে ওই জ্যোতিষবাবুই ওর মাথাটা খেয়েছেন। নইলে আস্তে আস্তে যেমন করে rise করছিলেন, আর বছর-দুই অপেক্ষা করলে Top artiste হয়ে যেতেন। আর তা ছাড়া উনি নাকি আজকাল প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। স্টুডিওতে যেতে পারছেন না।

সুনীলেশ বলল, বদ্রীদাসবাবু, উষাদেবী এখনও কি ওঁর পার্কসার্কাসের বাড়িতেই রয়েছেন?

—না। বদ্রীদাসবাবু বললেন, ওঁর বড়ো ভাইএর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় কয়েকমাস হল হিন্দুস্থান পার্কে নিজেই একটা বাড়ি ভাড়া করে চলে গিয়েছিলেন। ও বাড়িটাও আমার ভাই ঘনশ্যামের।

মাসে সাড়ে চারশ টাকা ভাড়া পাচ্ছিল উষাদেবীর কাছ থেকে। ঘনশ্যাম বলছিল, উষাদেবীর পক্ষে আর acting করা সম্ভব হবে না। বেচারার কি যে বেমারী হয়েছে ঠিক নেই। আজকাল রোজ বাড়িতে ডাক্তার আসছে।

শচীন্দ্রনাথ বললেন, আর কি বেমারী হবে বদ্রীদাসবাবু, সব হচ্ছে টাকার বেমারী। বুঝতে পারেন তো, টাকার বেমারী বড়ো জব্বর বেমারী। ভদ্রমহিলা যা রোজগার করেছিলেন, সব হারিয়েছেন। তার ওপর বলছেন, অসুস্থ হয়ে রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেমারীর নাম হচ্ছে Nervous breakdown.

বদ্রীদাসবাবু হাসতে হাসতে বললেন, লেকিন শচীনবাবু, হামারাভি তো ওহি বেমারী হ্যায়।

শচীন্দ্রনাথও বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে হাসতে লাগলেন।

প্রায় সাত-আট মাস হল উষার সঙ্গে সুশান্ত যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। খবরের কাগজে ছাপা ছবি ছাড়া উষার সঙ্গে আর কোনও সংযোগই ছিল না। ছুচারবার চেষ্টা করেছিলেন ফোনে কথা বলবার। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন। উষা একদিনও টেলিফোন ধরে নি। একদিন ওর বউদি স্পষ্টই বলে দিলেন, সুশান্ত পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি এখনও পাকে নি। যে-মেয়ে অমন করে জীবন থেকে একবার হারিয়ে যায়, সে কি আর ফিরে আসে? আর ফিরে এলেও তাকে গ্রহণ করে কে? উষার বউদির কাছ থেকেই সুশান্ত খবর পেয়েছিলেন যে উষা হিন্দুস্থান পার্কে নতুন বাড়ি ভাড়া করে চলে গেছে। শত চেষ্টা করেও সুশান্ত উষার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। কতদিন রাস্তায়-ঘাটে, সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ব্যর্থ আশায়, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। একদিন সুনীলেশকে বললেন, সারা হিন্দুস্থান পার্ক ছুই ঘণ্টা ধরে চক্কোর দিয়েও উষার পাত্তা করতে পারলাম না। পথ অনেকেই হারায়; তাই বলে এমন করে হারায়, তা আমার জানা ছিল না।

প্রায় মাস-তিনেক হল সুনীলেশ সুশান্তকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। উষাকে হারাবার পর থেকে সুশান্ত এত অদ্ভুতভাবে আনমনা আর ব্যর্থমনোরথ হয়ে পড়েছিলেন যে, সত্যিই ওঁকে একা থাকতে দেওয়া সুনীলেশ সমীচীন মনে করে নি।

সেদিন রাত্রিবেলা সুনীলেশ বাড়ি ফিরে দেখে সুশান্ত বসে একটা বই পড়ছেন। ওর মনে তখন এক নিদারুণ সংগ্রাম চলছে। উষার ব্যাপারটা সুশান্তর কাছে খুলে বলবে কি বলবে না! অনেক ভেবেচিন্তে ও শেষ পর্যন্ত স্থির করল, যে-জিনিস একদিন সুশান্ত জানবেনই, তা গোপন করে লাভ নেই। তারপর আস্তে আস্তে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বদ্রীদাসবাবুর কাছে শোনা সমস্ত ঘটনাটা সুশান্তকে বলল।

সুশান্ত হঠাৎ উন্মাদের মতো অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বার বার শুধু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, অসুখটা কী জানতে পারলেন না সুনীলেশবাবু? ওর তো gastritis ছিল, তার থেকে কিছু হয় নি তো?

জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা নষ্ট হয়েছে শুনে সুশান্তর মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। একবার শুধু বললেন, ব্যবসা করতে গেলে লাভ লোকসান দুইই আছে। শত হলেও ওটা একটা gambling, কিন্তু মানুষের শরীরটা নিয়ে তো আর gambling করা চলে না!

অস্থিরভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক পদচারণা করবার পর সুশান্ত সুনীলেশকে বললেন, চলুন, এক্ষুনি একবার উষার বাড়ি যাব।

সুনীলেশ বলল, কিন্তু……

সুশান্ত বলল, আজ আর কোনও কিন্তু নেই। উষা অসুস্থ। ভাবছেন আমাকে যদি অপমান করে, বাড়িতে ঢুকতে না দেয়? না দিক। তবুও আমি যাব।

অগত্যা সুনীলেশকে রাজী হতেই হল।

রাস্তায় বেরিয়ে বদ্রীদাসবাবুকে টেলিফোন করে সুনীলেশ উষার ঠিকানাটা যোগাড় করে নিয়ে যখন হিন্দুস্থান পার্কে ওর বাড়িতে গিয়ে পৌছল, তখন রাত্রি প্রায় নটা বাজে।

আজ আর কেউ বাধা দিল না। বাইরের সুসজ্জিত ড্রইংরুমে আজ কোনও ভিড় নেই। শুধু অনেকদিন আগেকার খাওয়া কতক গুলো সিগারেটের টুকরো ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। সোজা দুজনে দোতালায় উঠে গেল। সামনের একটা ঘর পেরোতেই উষাদের বাড়ির এক পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে দেখা। সুশান্তকে দেখে সে দৌড়ে এসে বলল, দাদাবাবু আপনি এসেছেন? দিদির অসুখের বড় বাড়াবাড়ি। চলুন ওঘরে।

উষা দামী একটা খাটের উপর উবু হয়ে শুয়েছিল। জুতোর শব্দে কাত হয়ে তাকিয়ে দেখল সুশান্ত এসেছে। সুনীলেশ ইচ্ছে করেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

সুশান্ত ঠিক আগেকার মতো দৌড়ে গিয়ে উষার পাশে বসলেন। তারপর ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অস্থির ভাবে বললেন, উষা, উষি, কি অসুখ হয়েছে তোমার? আমাকে বল।

উষা আবার উবু হয়ে পড়ে নিজের মুখ ঢাকল। হয়তো তখন দুঃখে, লজ্জায়, গ্লানিতে এবং আনন্দে ওর সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুশান্ত প্রায় পাঁচ মিনিট ওর মাথায় হাত বুলোবার পর ও উঠে বসল। তারপর সুশান্তর কোলের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। সুশান্ত বুঝলেন, উষার চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। উনি বললেন, উষা, তোমার কি হয়েছে বললে না তো? উষা এইবার উঠে বসে বালিশের তলা থেকে ডাক্তারের একখানা প্রেসক্রিপশন বের করে সুশান্তর হাতে দিল। সুশান্ত পড়ে দেখলেন— Cancer in the Stomach.

সুশান্ত উষার বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। একবার জানলার

ধারে গেলেন। তারপর বাইরের জমকালো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—

"অতিদূর তীর্থের যাত্রী
ভাষাহীন রাত্রি
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।"

তারপর একটু পরে এসে উষার খাটের কাছে একটা সোফার ওপর বসে পড়লেন। উষাও আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে এসে ওঁর পাশে বসল। তারপর সুশান্তর একটা হাত ওর নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তুমি কেমন আছ সুশান্ত?

সুশান্ত কৃতজ্ঞতায় ভাষা হারিয়ে ফেললেন। আজ কতদিন পর উষা ওঁর খবর জানতে চাইল। একটুখানি চুপ করে থেকে উনি বললেন, তুমি একি করলে উষা?

উষা এইবার মুখর হল। হঠাৎ একটা শীর্ণ ফল্গুধারা যেন বেগবতী স্রোতস্বিণীতে পরিণত হল। যেন এক মুহূর্তে পথের সব বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

সুশান্ত বাধা দিলেন না। এদিকে সুনীলেশ এসে আর একটা সোফায় বসে পড়েছে।

উষা ওকে উদ্দেশ করে বলল, জানেন সুনীলেশবাবু, আমি বারবার এক মহাসাগরকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই তার গভীরতার কাছে হার মেনেছি। এক উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গকে আমার স্পর্ধিত যৌবন দিয়ে বারবার আঘাত করবার বৃথা চেষ্টা করেছিলাম। সেই স্পর্ধার প্রত্যাঘাত আমার জীবনে ফিরে এসেছে।

তারপর একটুখানি থেমে সুশান্তর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, আমি তোমার কাছে শুধু একটা অনুগ্রহ চাই—আর যে কটা দিন বাঁচব, সে কটা দিন তোমার উষ্ণতা দিয়ে তুমি আমায় ঢেকে রেখো।

সুশান্ত বললেন, তোমায় জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। আমি মৃত্যুর ছায়াপথ থেকে তোমায় ফিরিয়ে আনব।

সুনীলেশ জানালা দিয়ে নিঃসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উষার কথা ভাবছিল। হঠাৎ সুশান্ত ওকে বললেন, সুনীলেশবাবু, সেদিন রাত্রিরে স্বপ্ন দেখছিলাম, উষা একটা মহাব্যাপ্ত সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

সুনীলেশ বলল, তারপর ?

সুশান্ত বললেন, সে-সমুদ্রে জল নেই, কাজেই প্রশান্তও নয়, অতলান্তিকও নয়। সে-সমুদ্রে শুধু লক্ষ লক্ষ স্বর্ণখণ্ড পড়ে রয়েছে, আর সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি পড়ে সমুদ্রটা যেন আগুনের মতো জ্বলছে।

সুনীলেশ বলল, ভাল করে পরখ করলে দেখতে পেতেন, সেই স্বর্ণ-সমুদ্রের ধারে শুধু উষাদেবী নন, আরও শত লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের চোখে লালসার বহ্নি আর বুকে কাঞ্চন-তৃষ্ণা।